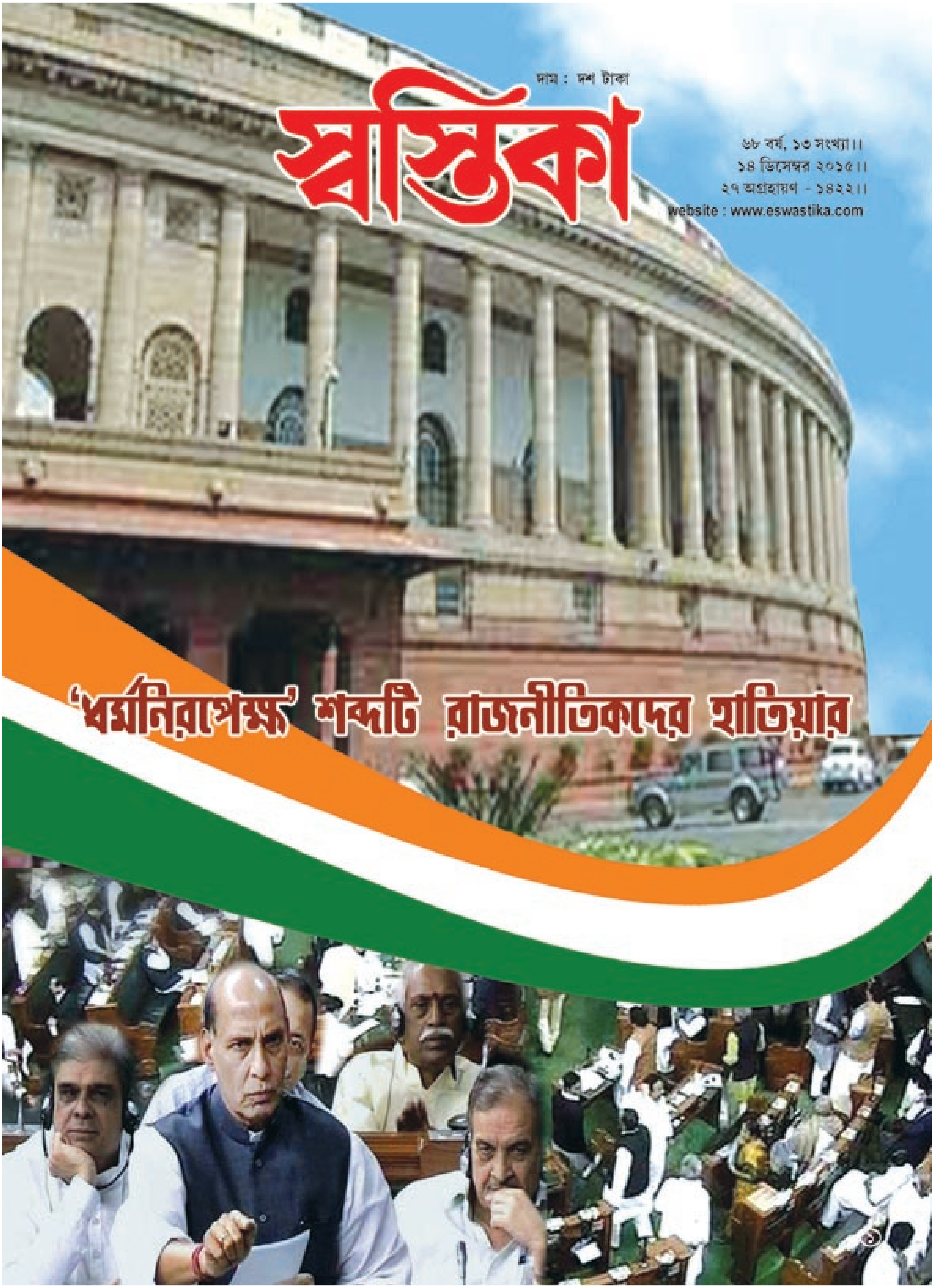

দাম : দশ টাকা
স্বস্তিকা
৬৮ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা।।
১৪ ডিসেম্বর ২০১৫।।
২৭ অগ্রহায়ণ - ১৪২২।।
website : www.eswastika.com
'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি রাজনীতিকদের হাতিয়ার

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৮ বর্ষ ১৩ সংখ্যা, ২৭ অগ্রহায়ণ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

১৪ ডিসেম্বর - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৭,

Website : www.eswastika.com

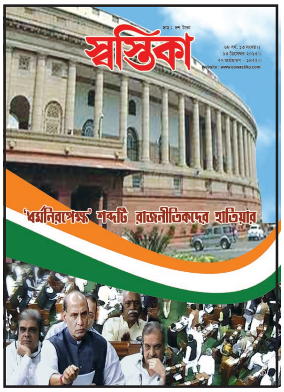

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৯

হিন্দু বিদ্বেষে বিএনপি এবং আওয়ামি লিগের চরিত্রগত পার্থক্য নেই □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

অবস্থা এমন, হয় মুসলমান হতে হবে, নইলে দেশ ছাড়তে হবে □ ১১

প্রতিবাদ গণতন্ত্রে জরুরি তবে তা নিরপেক্ষ ও গঠনমূলক হওয়া উচিত □ সমর কুমার বোস □ ১২

ধর্মনিরপেক্ষ নিয়ে এত হৈচৈ কেন?
□ ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় □ ১৪

ধর্মনিরপেক্ষতা ও পঞ্চম বাহিনী □ অচিন্ত্য বিশ্বাস □ ১৭

কালিকা পুরাণের ইতিবৃত্ত □ রবীন সেনগুপ্ত □ ২১

মন্ত্রমালা : ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শতনাম
□ সুনীল কুমার দাস □ ২২

কোনো কিছু পছন্দ না হলেই ভদ্রতার আভরণ যদি খসে পড়ে তার চেয়ে পরিতাপের আর কিছুই নেই □ চেতন ভগত □ ২৭

বর্তমান কাঠামোয় সংরক্ষণ বিধি অসাংবিধানিক
□ তারক সাহা □ ২৯

প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চা-২ : দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত □ ৩১

কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চর্বিত-চর্বন
□ বিকাশ ভট্টাচার্য □ ৩৬

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** □ **অঙ্গনা : ২৬** □

অন্যরকম : ৩৩ □ **পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৫**

□ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৭-৩৮** □ **খেলা : ৩৯** □

শব্দরূপ : ৪০ □ **চিত্রকথা : ৪১**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

‘ডিজিটাল ইণ্ডিয়া’

জগতসভায় শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণের জন্য ভারতবর্ষের এ এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির যুগে ভারতের অবিসংবাদিত প্রভাব বিশ্বকে পথ দেখিয়েছে। কিন্তু কী এই ‘ডিজিটাল ইণ্ডিয়া’? দেশ-নিন্দুকেরা যদি একে প্রচারের ঢক্কানিনাদ বলেনও, আমরাও কি সেই চলতি স্রোতে গা ভাসাব। না একবিংশ শতাব্দীতে ভারতের বিশ্ব-জয়ের মহামন্ত্রকে উচ্চকণ্ঠে উচ্চকিত করবো? উত্তর খুঁজলো স্বস্তিকা। আলোচনায় সুপর্ণ মৈত্র, অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাশিষ আইয়ার।

স্বস্তিকা

অশোক সিংহল স্মরণ সংখ্যা

সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন হিন্দু পুনর্জাগরণের পুরোধা ও রামজন্মভূমি আন্দোলনের অগ্রণী পুরুষ অশোক সিংহল। তাঁর প্রতি স্বস্তিকা-র শ্রদ্ধাঞ্জলি— অশোক সিংহল স্মরণ সংখ্যা। রঙিন এই সংখ্যাটিতে প্রয়াত সিংহলের ব্যক্তিত্ব ও কর্তৃত্ব নিয়ে থাকবে আলোচনা। থাকবে সিংহলজীর জীবনের বেশ কিছু ঘটনার ছবি। সংখ্যাটি সংরক্ষণযোগ্য করা হবে।

প্রকাশিত হচ্ছে ৪ জানুয়ারি, ২০১৬
দাম একই থাকছে ১০্ টাকা।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বিচিত্র রাজনীতি

নরেন্দ্র মোদী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হইবার পরে দেশের রাজনীতির বিচিত্র চিত্র দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। আজ সকলেই সাধু সাজিয়া ধোয়া তুলসী পাতা হইয়াছেন। যত দোষ এবং অপরাধ করিতেছেন কেবল নরেন্দ্র মোদী। তাঁহার জন্যই নাকি দেশের এই পরিস্থিতি। তাঁহার প্রধানমন্ত্রী হইবার ফলেই নাকি পাকিস্তান সীমান্তে সন্ত্রাস চালাইতেছে, দেশে অসহিষ্ণুতার সৃষ্টি হইয়াছে এবং সম্ভবত চেন্নাইতে অসময়ে বৃষ্টিপাত হইয়া বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে তাঁহার জন্যই। আজ রাহুল গান্ধীও যত্রতত্র জ্ঞান বিলাইতেছেন। দেশে জরুরি অবস্থা সৃষ্টির নায়কেরা আজ অসহিষ্ণুতা লইয়া নরেন্দ্র মোদীকে দোষী সাব্যস্ত করিতেছেন, সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের কুশীলবরা অসহিষ্ণুতা লইয়া আজ জ্ঞান দিতেছেন, কামদুনি বারাসত কাকদ্বীপের নায়কেরা আজ অসহিষ্ণুতা লইয়া মন্তব্য করিতেছেন। এই কারণে অসহিষ্ণুতা লইয়া সরব হইলেও বিধানসভার অধিবেশনে আলোচনায় আগ্রহী নয় তৃণমূল। বিহারে বিজেপি পরাজিত হইয়াছে কিন্তু ইহার জন্য পাকিস্তানে বাজি পুড়িয়াছে। সেই দেশের সংবাদপত্রে বিরোধীদের অভিনন্দন জানানো হইয়াছে। সম্প্রতি রাহুল গান্ধী অভিযোগ করিয়াছেন, নরেন্দ্র মোদী ইচ্ছাকৃতভাবে শ্রমসংক্রান্ত আইন দুর্বল করিতেছেন। মোদী সরকার শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী একের পর এক আইন আনিবার ব্যাপারে নাকি উদ্যোগী হইয়াছে। উল্লেখ্য, রাহুল গান্ধীর অতীত ইতিহাস জানা নাই বলিয়া এমন মন্তব্য করিয়াছেন। দেশের শ্রম আইন যিনি প্রথম দুর্বল করিয়াছেন তিনি রাজীব গান্ধী। উন্নয়নের নামে তিনি শ্রমিক স্বার্থবিরোধী নানা কাজ করিয়া গিয়াছেন। কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও উদার অর্থনীতির নামে শ্রমিকের সর্বনাশ করিয়াছিলেন। 'উদারীকরণ' 'বিলগ্নীকরণ' প্রভৃতি শব্দ কংগ্রেসের তৈরি এবং ইহার মাধ্যমে দেশের শ্রমিকদের তাহারা শোষণ করিয়াছেন বহুকাল। আজ যখন সেই শ্রমিকদের স্বার্থে নানা পরিকল্পনা রূপায়ণের চেষ্টা চলিতেছে তখন রাহুল গান্ধীর এহেন মন্তব্য শিশু সুলভ এবং বোধবুদ্ধি বিবেচনা প্রসূত নয় বলিয়াই মনে হয়। তবে তিনি এই কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে মোদী দেশকে 'বিশ্বজনীন উৎপাদন কেন্দ্র' হিসাবে গড়িবার চিন্তাভাবনা করিতেছেন। কেন্দ্র যদি শ্রমিক ও শিল্প কারখানার মধ্যে যোগাযোগ গড়িবার কাজ করে, তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যেই ভারত বিশ্বজনীন উৎপাদন কেন্দ্র হইয়া উঠিবে। তখন ভারত চীনকেও টপকাইয়া যাইবে। আর এই কার্যে সফল হইলে শ্রমিকরা আর নিজেদের ভবিষ্যৎ লইয়া অনিশ্চয়তায় ভুগিবেন না। তাঁদের পরিবার ও সন্তানদের ভবিষ্যৎও সুনিশ্চিৎ হইবে।

রাহুল গান্ধী ইদানীং দেশের যত্রতত্র কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে যাহা যাহা বলিতেছেন তাহা সবই অজ্ঞতা প্রসূত। কৃষি এবং জমিনীতি কংগ্রেসেরই অবদান কারণ রাজ্যসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ না হইবার ফলে নতুন কোনো নীতি তৈরি হয় নাই। সেই একই কারণে মোদীর পক্ষে শ্রমিক স্বার্থবিরোধী কোনো আইন আনা সম্ভব নয়। মোদী যাহা বলিতেছেন সবই কংগ্রেসের তৈরি, যাহা করিতেছেন সবই কংগ্রেসের আমলের। তাহা হইলে রাহুল গান্ধীর এই বাচালতা কেন? আসলে জনগণের দ্বারা বিপুল ভোটে পরাজিত হইয়া কংগ্রেস জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তাই নিজেদের প্রাসঙ্গিক রাখিবার জন্য এই বিচিত্র রাজনীতি। দেশে অস্থিরতা তৈরির জন্য মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের লইয়া অসহিষ্ণুতার নাটক তৈরি এবং দেশের সর্বত্র মোদী বিরোধী বাতাবরণ সৃষ্টি করা ইহার অঙ্গমাত্র। শিখ দাঙ্গার নায়কেরা আজ বিড়াল তপস্বী সাজিয়া সাম্প্রদায়িকতার যাত্রাপালা পরিবেশন করিতেছে মাত্র। আই এসের এই দালালবাহিনী যে কালিদাসের মতো নিজ গাছের ডাল কাটিতেছেন তাহা বুঝিবার মতো তাহাদের বোধবুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। জাতীয়তাবাদী ভারতবাসীর এই দেশোদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সজাগ থাকিতে হইবে। ইহারা হইতেছে শাঁখের করাত মাত্র। মোদী কেন পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনায় বসিতেছেন না তাহা লইয়া সমালোচনা হইতেছে আবার সুষমা স্বরাজ কেন পাকিস্তানে গিয়া আলোচনা করিবেন তাহা লইয়াও সমালোচনা হইতেছে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক চেতন ভগতই আসল কথাটি কিছুদিন পূর্বে বলিয়াছিলেন, মোদী সাধারণ ঘরের সন্তান বলিয়া এতো সমালোচনা হইতেছে, তিনি দুন স্কুলের ইংরেজি 'এটিকেট' জানা মানুষ হইলে সমালোচনা হইত না।

সুভাষিতম্

যুক্তিযুক্তং বচোগ্রাহ্যং বালাদপি শুকাদপি।
যুক্তিহীনং বচস্ত্যাজ্যং বৃদ্ধাদপি শুকাদপি।।
যুক্তিযুক্ত কথা বালকের হলেও শোনা দরকার। আর যুক্তিহীন কথা বৃদ্ধ বললেও তা গ্রহণ করা উচিত নয়।

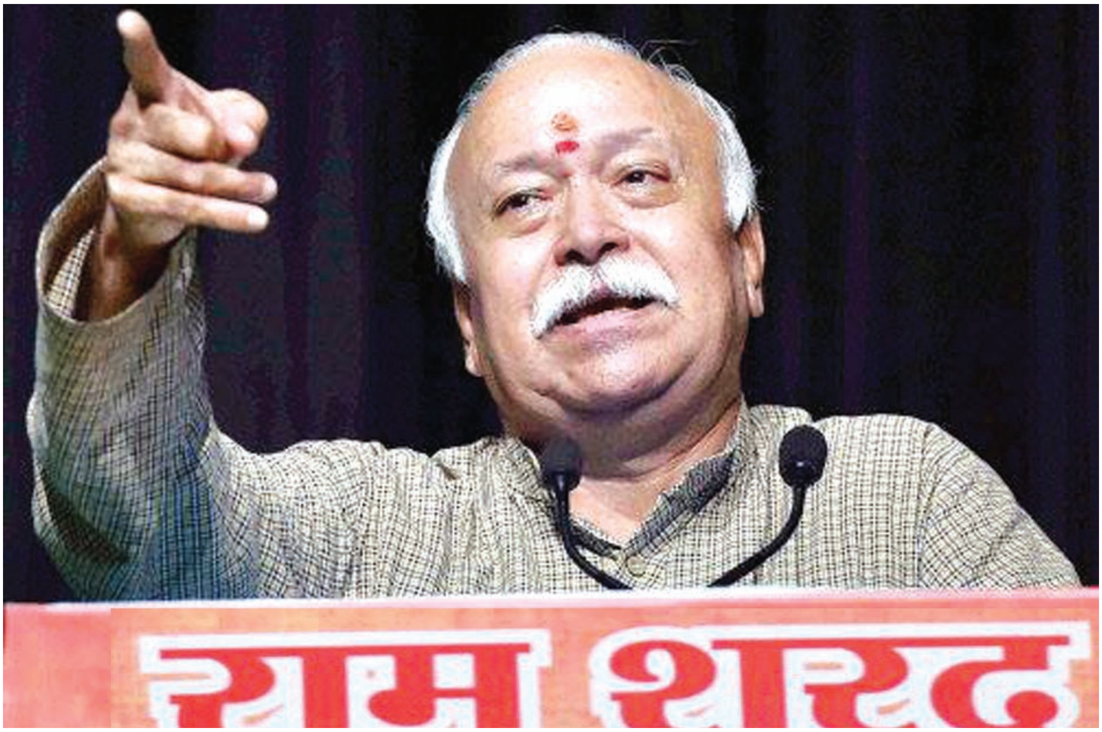

রাম-শরদের আত্মবলিদানকে স্মরণ করে রামমন্দির নির্মাণের শপথ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ রামমন্দির আন্দোলনের দুই অমর শহীদ রাম কোঠারী, শরদ কোঠারী-র আত্মবলিদানের সিকি শতাব্দী উপলক্ষে ভাবগম্ভীর পরিবেশে পালিত হলো 'রাম শরদ কোঠারী প্রতিভা সম্মান ২০১৫'। গত ২ ডিসেম্বর কলকাতায় সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত, ত্রিপুরার রাজ্যপাল তথাগত রায়-সহ বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে সামাজিক, চিকিৎসা ও শিক্ষাক্ষেত্রের তিন সম্মানীয় ব্যক্তিত্ব যথাক্রমে দীনদয়াল গুপ্ত, ডা. অরুণ ব্যানার্জি ও ড. মোহিত রায়-কে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। কানায় কানায় পূর্ণ অডিটোরিয়ামে এই অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিল রাম শরদ কোঠারী স্মৃতি সঙ্ঘ। অনুষ্ঠানে রাম-শরদের বীর-জননী সুমিত্রাদেবী কোঠারীর নাম ঘোষণা হওয়া মাত্র করতালিতে ফেটে পড়া আর দাঁড়িয়ে উঠে সম্মান জানানো হলঘর বুঝিয়ে দিয়েছে রামমন্দির আন্দোলনের দুই অমর শহীদকে তাঁরা ভুলে জাননি। তবে রামমন্দির আন্দোলনের কারিগর অশোক সিঙ্ঘলজী-র প্রয়াণ ভারাক্রান্ত রেখেছিল অনুষ্ঠান-সভাকে। তাঁর জন্য এক মিনিটের নীরবতা পালিত হয়।

এই প্রসঙ্গ তুলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত বলেন, 'অযোধ্যায় রামজন্মভূমি স্থলে মন্দির নির্মাণের বিষয়টাই বড়ো কথা নয়। মনে রাখতে হবে এটা জন্মভূমি। জন্মভূমি একটিই হয় এবং এই জন্মভূমি তাঁর যিনি ভারতবর্ষের মর্যাদার প্রতীক। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এদেশে আবহমানকাল থেকে চলে আসছে। এটাই হিন্দু সংস্কৃতি। ভৌগোলিক ভারত ছোটো-বড়ো হতেই পারে। কিন্তু ভারতীয় তথা আর্য সংস্কৃতির ব্যাপ্তি সুবিশাল। রামচন্দ্র এরই প্রতীক। আমাদের আধার আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের স্বাভিমান রয়েছে এরই ভিতর। একে রক্ষা করতেই হবে।' তিনি আরও বলেন, 'যে কোনো রাষ্ট্রেরই সংহতি (ইন্টিগ্রেশন)-র পেছনে আবেগ (ইমোশন) কাজ করে। এটাই দেশকে একসূত্রে বেঁধে রাখে। রামচন্দ্র হলেন আমাদের আবেগ। একে আঘাত করার অর্থ দেশের সংহতিকে বিপন্ন করা।' রাম-শরদের প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য : 'রূপ, দেহ, নাম ইত্যাদি অল্পদিনের, কিন্তু সুকৃতী সারাজীবনের। রাম-শরদ আজ পার্থিব রূপে নেই কিন্তু তাঁদের চিরদিন স্মরণ করবো।' অনুষ্ঠানের সভাপতি ত্রিপুরার মাননীয় রাজ্যপাল তথাগত রায় রাম-শরদের আত্মবলিদানকে বাংলার অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের পরম্পরা উল্লেখ করে বলেন, 'যে কোনো মানুষের প্রিয়তম জিনিস তার নিজের জীবন। আর তা আদর্শের জন্য উৎসর্গিত হয়েছিল। যে উৎসর্গের পেছনে কোনো প্রলোভন ছিল না, পরলোকের কোনো প্রাপ্তির আশা ছিল না। এই আদর্শের নামই হলো রাম। যাঁর ধারণা মর্যাদা-পুরুষোত্তমের।' অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী ও উদ্যোগপতি জয়প্রকাশ আগরওয়াল, শিল্পপতি ও সমাজসেবী মুরারীলাল খৈতান, আর এস এসের পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক অজয় নন্দী প্রমুখ। শুরুতে রাম-শরদের আত্মবলিদানকে স্মরণ করে রচিত গীতি-কাব্য আলেখ্যটি সকলের প্রশংসা পায়।

নেপালে শান্তি ফেরাতে নয়া সংবিধানে সাতটি পরিবর্তন চায় ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রায় তিনমাস হতে চললো নেপালে বৈষম্যমূলক নয়া সংবিধান লাগু হয়েছে। এর মধ্যে মাধেসীদের প্রতিবাদ চরম আকার ধারণ করেছে। প্রায় অর্ধশতাধিক মাধেসী সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনহানি হয়েছে। পরিস্থিতি দিন-কে-দিন খারাপের পর্যায়ে চলে যাওয়ায় ভারত গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। আন্তর্জাতিক মহল থেকেও এনিয়ে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করা হয়েছে। তবে ক্রমেই এর পেছনে চীনের ছায়া লম্বা হচ্ছে। মাধেসীদের আন্দোলনে রাক্সাউল- বীরগঞ্জের সীমান্তে ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ২০০০-নেপালের ট্রাক সেদেশে ঢুকতে পারছে না। আর এ ব্যাপারে মাধেসীদের আন্দোলনের পেছনে ভারতের হাত রয়েছে বলে জিগির তুলে সেদেশে ভারত-বিরোধী হাওয়া আরও জোরদার করা হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে নেপালের মাওবাদীরা বরাবরই সক্রিয়। তবে এবার তাদের কাছে বড় ধাক্কা দলের সবচেয়ে বড়ো বুদ্ধিজীবী ও সেদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বাবুরাম ভট্টরাই পদত্যাগ করে মাধেসীদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

এই ঘোরালো পরিস্থিতিতে ভারত চাইছে নেপাল তাদের নয়া সংবিধানে সাতটি পরিবর্তন করে পরিস্থিতি সামাল দিক। প্রথমত, ভারতের বক্তব্য মাধেসীদের নির্বাচনী ক্ষেত্র তাদের জনসংখ্যার ভিত্তিতে হোক। নেপালের অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান (২০০৭)-এর ৬৩ (৩) ধারা অনুযায়ী নির্বাচনী ক্ষেত্রগুলি জনসংখ্যা, ভৌগোলিক সীমানা, বিশেষ চরিত্র এবং 'মাধেসীদের জন্য জনসংখ্যার শতাংশের' ওপর ভিত্তি করে গঠিত হবে। এই শেষোক্ত বিষয়টি নেপালের নয়া সংবিধানের ৮৪ নম্বর ধারা থেকে বিনা কারণেই বাতিল করে দেওয়া হয়। ভারত এটিকে পুনঃসংযোজিত করতে চাইছে। নেপালের নয়া সংবিধানের ৪২ নম্বর ধারায় বলা রয়েছে রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর অংশগ্রহণ করার অধিকার অন্তর্ভুক্তির নীতি অনুযায়ী হবে। ভারত এর মধ্যে 'সমানুপাতিক' শব্দটি ঢোকাতে চাইছে। কারণ অন্তর্বর্তী সংবিধানের ২১ নম্বর ধারায় উল্লেখ ছিল যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর 'রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় অংশগ্রহণের

অধিকারের ক্ষেত্রে সমানুপাতিক অন্তর্ভুক্তির নীতিকে মান্যতা দেওয়া হবে।' অথচ নয়া সংবিধানের ৪২ নম্বর ধারাতে এই 'সমানুপাতিক' শব্দটিকে বেমালুম উধাও করে দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয়ত, কার্যালয় পদাধিকারীদের নাগরিকত্বের বিশেষ সংস্থানের ক্ষেত্রে ২৮৩ নম্বর ধারার তিনটি সংশোধন গৃহীত হয়েছে। ধারাটিতে তাদের কথাই বলা রয়েছে যারা বংশগত বা কুলমর্যাদার জেরে নাগরিকত্ব পেয়ে রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতি, সংসদের অধ্যক্ষ, জাতীয় সভার অধ্যক্ষ, প্রদেশের প্রধান, মুখ্যমন্ত্রী, প্রাদেশিক সভার অধ্যক্ষ এবং নিরাপত্তা সংস্থাগুলির প্রধান পদের দাবিদার। দিল্লীর বক্তব্য— জন্মগত বা স্বাভাবিকত্বের জেরে সাধারণ নাগরিকত্বের বিষয় সম্পর্কিত ধারাটি সংশোধন করে ঢোকাতে হোত যেহেতু মাধেসীদের একটা বড়ো অংশ জন্মগত বা স্বাভাবিকতার জেরে নাগরিকত্বের দাবিদার। চতুর্থত, ভারত চাইছে জাতীয় সভা গঠিত হোক প্রাদেশিক জনসংখ্যার ওপর ভিত্তি করে। কিন্তু নয়া সংবিধানের ৮৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী সাতটি রাজ্যের প্রতিটি থেকে আটজন করে সদস্য নিয়ে জাতীয় সভা গঠিত হবে এবং এতে তিনজন মনোনীত সদস্য থাকবেন।

পঞ্চমত, ভারতের বক্তব্য পাঁচটি বিতর্কিত জেলা যথা, ঝাপা, মোরাং, সানসারি, কাঞ্চনপুর এবং কাইলালি-কে মাধেস প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। বর্তমানে এই জেলাগুলি প্রদেশ এক (ঝাপা, মোরাং, সানসারি) এবং প্রদেশ ছয় (কাইলালি, কাঞ্চনপুর)-এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে অন্য পার্বত্য জেলাগুলির সঙ্গে। ফলত, মাধেসীদের অধিকার এতে ব্যাহত হবার সম্ভাবনা। ষষ্ঠত, ২৮১ (১২) নম্বর ধারা অনুযায়ী নির্বাচনী ক্ষেত্রগুলির পুনর্বিন্যাস কুড়ি বছর অন্তর বিবেচিত হবে। যদিও অন্তর্বর্তী সংবিধানে এই সময়সীমা ছিল দশ বছরের। ভারত এই দশ বছরের প্রস্তাবই পুনর্বিবেচনার কথা বলেছে। আর সপ্তমত, নেপালের নয়া সংবিধানের ১১ (৬) ধারা অনুযায়ী, বিদেশী কোনো মহিলা কোনো নেপালীকে বিবাহ করলে গণতান্ত্রিক আইন অনুযায়ী স্বাভাবিক নিয়মেই তিনি নেপালের নাগরিকত্ব পেতে পারেন। মাধেসীদের রাজনৈতিক দলগুলি চাইছে আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে আপনা হতেই এই স্বাভাবিক নাগরিকত্ব নিশ্চিত করতে। দিল্লীরও সমর্থন রয়েছে এতে।

প্রসঙ্গত, ২০০৭ সালে নেপালের সংসদে অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান পাশ হয়। ১৯৪৮ পরবর্তী সময়ে স্বশাসিত রানা বা রাজাদের শাসন অন্তত ছ'টি সংবিধানের মাধ্যমে পরিত্যক্ত হয়। তারপর ২০০৬-এর এপ্রিলে নেপালে যে অভ্যুত্থান হয় তাতে রাজার শাসনের অবসান হয় এবং তারপর থেকেই নয়া সংবিধানের খোঁজ চলছিল। কিন্তু বহু সংগ্রামের পর ২০১৫-এর ২০ সেপ্টেম্বর যে নয়া সংবিধান ভূমিষ্ঠ হলো তা-ও বৈষম্যমূলক এবং অশান্তির আগুন জ্বালাতে যথেষ্ট— এমনটাই মত বিশেষজ্ঞদের।

আগামী কুড়ি বছরে বাংলাদেশ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে হিন্দুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ আগামী ২০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে হিন্দুরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বাংলাদেশে অসাম্প্রদায়িক সরকার ক্ষমতায় থাকলেও হিন্দুদের উপর নির্যাতন বন্ধ হয়নি। হিন্দুদের ক্ষমতায়ন ও সরকারে তাদের প্রতিনিধিত্বও নেই। গত ৪ ডিসেম্বর এই মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান। ঢাকার সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের আয়োজিত এক সমাবেশে তিনি একথা বলেন। তিনি আরও বলেন, যে দেশে সংখ্যালঘু অর্থাৎ হিন্দুরা নিজের ইচ্ছায় নিজেদের সব জায়গা-জমি সংখ্যাগরিষ্ঠের অর্থাৎ মুসলমানদের কাছে বিক্রি করেছেন, সেই দেশে তারা থাকবেন কেমন করে। আওয়ামি লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও প্রাক্তন মন্ত্রী সুরজিৎ সেনগুপ্ত বলেন, হিন্দুদের নিরাপত্তা দিতে শেখ হাসিনা সরকার ব্যর্থ হয়েছে। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন গত সাত বছরে হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করার মতো কোনো প্রচেষ্টা সরকারের পক্ষ থেকে করা হয়নি। উল্লেখ্য, দেশ ভাগের সময় বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৩৭ শতাংশ, ১৯৭১-এ হিন্দু জনসংখ্যা দাঁড়ায় ২১ শতাংশ। এখন তা নেমে এসেছে ১০ শতাংশে। আগামী ২০ বছরের মধ্যে যে একজন হিন্দুকেও বাংলাদেশে পাওয়া যাবে না এই পরিসংখ্যানেই তা স্পষ্ট।

তালাকের বিরুদ্ধে সোচ্চার রাষ্ট্রীয় মুসলিম মঞ্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত ৩ ডিসেম্বর রাজস্থানের আজমীরে এক সভায় তালাকের বিরুদ্ধে মুসলমান মহিলারা সোচ্চার হলেন। রাষ্ট্রীয় মুসলিম মঞ্চ এই সভার উদ্যোক্তা। পাঁচশোরও বেশি মুসলমান মহিলা এদিন এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তালাকের মতো অনৈতিক প্রথা না মানার কথাই এই সভায় বারবার উচ্চারিত হতে দেখা গেল। 'স্মল ফ্যামিলি, হ্যাপি ফ্যামিলি' (ছোটো পরিবার, সুখী পরিবার) শীর্ষক এই অনুষ্ঠানটিতে প্রধান বক্তা ছিলেন রাষ্ট্রীয় মুসলিম মঞ্চ-এর আহ্বায়ক তথা বর্ষীয়ান আর এস এস প্রচারক ইন্দ্রেশ কুমার। শ্রীকুমার অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে কয়েকটি প্রকল্পের সূচনা করেন যার মধ্যে রয়েছে একটি ফুড ব্যাঙ্ক প্রোগ্রাম। মহিলাদের এবং গরীব মুসলমান পরিবারের জন্য একটি জনকল্যাণমূলক ট্রাস্টের কথাও ঘোষণা করেন। ২১ ডিসেম্বর আশফাক্ আল্লাহ্ তালিম এবং জনকল্যাণ ট্রাস্ট-এর পথ চলা শুরু হবে পুনের মাটি থেকে। শ্রীকুমার আরোও বলেন, 'বিভিন্ন বিজনেস হাউস এবং মুসলমান সমাজেরই বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আমাদের এবিষয়ে সাহায্য করছেন।' তিনি বলেন, রাষ্ট্রীয় মুসলিম মঞ্চ যা মুসলমান সমাজের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের নিমিত্তে কাজ করে, তারই মহিলা শাখার দ্বারা এই ট্রাস্টটি পরিচালিত হবে। যারা সারাদিন কঠোর পরিশ্রম সত্ত্বেও দু'বেলা দু'মুঠো খাবার খেতে পায় না, তাদের জন্য খাদ্য সংস্থান করবে এই ট্রাস্ট। 'আনাজ ব্যাঙ্ক যোজনা' এদের জন্য ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। গো-মাংস ভক্ষণের বিরোধিতাও এই মঞ্চ থেকে উঠে আসে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানস্থলের চতুর্দিকে 'লিভ বিফ্ পার্টি অ্যান্ড অ্যাডপ্ট মিল্ক পার্টি'র ব্যানার ছেয়েছিল।

খেতাবহীন খেতাবধারী

আর টি আই সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে জম্মু-কাশ্মীর সরকারের তরফে বলা হয়, সেই রাজ্যে 'শের-ই-কাশ্মীর' নামে কোনো তকমা সরকারিভাবে কোনোদিনই কাউকে দেওয়া হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কাশ্মীর উপত্যকার ন্যাশনাল কনফারেন্স দলের প্রতিষ্ঠাতা ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাই এই খেতাবধারী বলে পরিচিত। শ্রীনগরের বহু হাসপাতাল, স্টেডিয়াম, রাস্তাঘাটও এই তথাকথিত 'শের-ই-কাশ্মীরের' নামাঙ্কিত। এই খবর চাউর হতেই ক্ষেপে উঠেছেন তাঁর পারিবারিক এন সি দলের লোকজন। তারা প্রয়াত শেখ আবদুল্লাকে সরকারিভাবে তড়িঘড়ি এই খেতাব দিয়ে নথিভুক্তকরণ করার জন্য শরগোল ফেলে দিয়েছে। কাশ্মীরী বাঘ বেশ বেকায়দায়।

মহাপ্রভুর যাত্রাপথ

ঠিক ৫০০ বছর আগে ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন যাত্রাপথের বিস্মৃত পবিত্র স্থানগুলিকে আবিষ্কার করতে পদব্রজে বেরিয়েছিলেন। চৈতন্য মহাপ্রভুর বৃন্দাবন ভ্রমণের পঞ্চম শতাব্দী উদযাপন করতে সেই কেওনঝাড়, রাঁচী, বারাণসী, মথুরার পদধূলি অনুসরণ করেই কলকাতার গৌড়ীয় মিশনের ২৫০ জন সন্ন্যাসী ভক্ত পুরী থেকে যাত্রা শুরু করেন। ২২ দিনের এই পরিক্রমা তাঁরা শেষ করেন ১৮ নভেম্বর। বৃন্দাবনের সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি। ধন্য ভক্তজন।

ভারত পেছপা হবে না

সম্প্রতি প্যারিসে অনুষ্ঠিত আবহাওয়া সংরক্ষণ সংক্রান্ত শীর্ষ সম্মেলনে আমেরিকার তরফে উন্নতিশীল দেশগুলিকে clean energy ব্যবহারের পরামর্শের উত্তরে ভারতের পরিবেশ মন্ত্রী জাভেদকর খোলাখুলি জানিয়েছেন যে অতীতে আমেরিকা যখন উন্নতিশীল দেশ ছিল তখন তারা ভারতের বহুগুণ পরিবেশ দূষণকারী খনিজ সম্পদ (কয়লা) বিদ্যুৎ উৎপাদানে ব্যবহার করত। আজও সেখানকার নাগরিক পিছু কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ লাগে ১৫ হাজার kwh (কিলোওয়াট আওয়ার) সেখানে ভারতের লাগে ১ হাজার kwh। মন্ত্রী জানান এই সব পশ্চিমী দেশগুলি পর্যাবরণ দূষিত করার পর আজ টনক নড়ায় ভারতকে খনিজ কয়লার সম্পদ ফেলে রেখে তিন গুণ দাম দিয়ে আরও স্বচ্ছ এনার্জি কিনে বিদ্যুৎ তৈরির উপদেশ দিচ্ছে। ভারত তা মানবে না।

হজে গিয়ে নিখোঁজ হজযাত্রী

আর্থিক প্যাকেজে জঙ্গিবাদকে প্রশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ একদিকে যখন রাজ্যে একের পর এক পাক-চর, আই এস আই এজেন্ট ধরা পড়ছে তখন দেশের নিরাপত্তা ক্ষেত্রে এর দ্বিগুণ মাথাব্যথা বাড়িয়েছে হজ করতে গিয়ে এ রাজ্যের হজযাত্রীদের উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনা। মমতা-সরকার আসার পর থেকেই হজযাত্রা রীতিমতো সরকারি অনুদানে বা আরও ভালোভাবে বললে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সংঘটিত হয়ে থাকে। একটি তথ্য পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে ২০১১ সালে হজ করতে গিয়ে উধাও হয়েছেন ১৬৬ জন, তার পরের বছর অর্থাৎ ২০১২ সালে এই সংখ্যাটা গিয়ে দাঁড়ায় ৩০। ২০১৩ ও ২০১৪-য় এরকম নিখোঁজের সংখ্যা নেই বটে কিন্তু এবছর অর্থাৎ ২০১৫ সালে ২৭ জন হজযাত্রীর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এরা মূলত মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বাসিন্দা। জেড্ডাহ-র ভারতীয় কনসাল জেনারেল বি এস মুবারক এবং কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রককে উদ্ধৃত করে একটি সর্বভারতীয় ইংরেজি দৈনিকে এই চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

মুবারক এ রাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রকের অধীনে থাকা রাজ্য হজ কমিটিকে লেখা এক চিঠিতে জানিয়েছেন, 'এমন আশঙ্কা করা যাচ্ছে যে এই নিখোঁজদের আরও বৃহত্তর স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে।' যদিও এই 'বৃহত্তর স্বার্থে'র অর্থ বুঝতে নারাজ রাজ্য সরকারের অধীনস্থ হজ কমিটি। কমিটির সভাপতি তথা প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ মামুলি প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন যে তাঁরা এনিয়ে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন, নিখোঁজদের পরিবারবর্গের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন, বিদেশ মন্ত্রককে চিঠি লিখেছেন ইত্যাদি। অন্যদিকে হজযাত্রার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা বিশেষ আধিকারিক খলিল আহমেদের বক্তব্য— তিনি মুর্শিদাবাদ প্রশাসনের কাছ থেকে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চেয়েছেন। প্রসঙ্গত, ২০১১ সালে যে ১৬৬ জন হজযাত্রী নিখোঁজ হয়েছেন তারা প্রত্যেকেই মুর্শিদাবাদের।

প্রশ্ন উঠছে, রাজ্যের চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ার প্রবণতা নিয়ে। যে আই এস আই এজেন্টরা তাদের পার্টিতেই ঢুকে বসেছিল তাদের ধরপাকড় শুরু হলো সব জানাজানি হতে। আবার একইভাবে হজযাত্রীদের ক্ষেত্রে পুরোটাই বর্তমান শাসক দলের বিপুল ভোটব্যাঙ্কের দিকে লক্ষ্য রেখে যাবতীয় সরকারি আর্থিক দাক্ষিণ্যে করা। আমার-আপনার করের টাকা দিয়ে কি সন্ত্রাসবাদকে উৎসাহ জোগানো হচ্ছে— এমন প্রশ্নও উঠছে। কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রকের হজ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব অজিত গুপ্ত আলাদাভাবে চিঠি লিখে রাজ্য সরকারকে এ নিয়ে বিস্তারিত তদন্তের অনুরোধ জানিয়েছেন।

উবাচ

"এতে অবাক হবার কিছু নেই। কিন্তু অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তদন্ত সঠিক পথে চলা উচিত। কেননা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মৌলবাদীদের তোষণ করে মুসলমান ভোট হাসিল করতে তৃণমূল যে কোনো কাজ করতে পেছপা নয়।"

—সিপিএম সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি।

আই এস জঙ্গি সংগঠনের জড়িত সন্দেহে তৃণমূল নেতা-কর্মীর গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে।

"ব্যাঙ্কের নিজস্ব আইন কানুনের কড়াকড়ির জন্যই ব্যাঙ্ক বহু সময়ে দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষকে ঋণের আওতায় আনতে পারে না। ফলে এরা ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার বাইরেই থেকে যায়। পরিণামে মাথাচাড়া দেয় এক ছায়া ব্যাঙ্কিং পরিষেবা (shadow Banking) যার মধ্যে অনেক বেআইনি কাজকর্ম জড়িয়ে থাকে।"

এস বি আই চেয়ারম্যান শ্রীমতী অরুন্ধতী ভট্টাচার্য।

নন ব্যাঙ্কিং ফাইনানসিয়াল কোম্পানির বাড়বাড়ন্ত প্রসঙ্গে।

"ছবিতে যতটা দেখেছিলাম, ততটা দূষিত নয় গঙ্গা। সরকারের প্রচেষ্টায় একটা পরিবর্তন চলছে।"

৬ মহাদেশের ৮ কন্যা, নৌকায় গোমুখ-ডায়মণ্ড হারবার অভিযানের কথা প্রসঙ্গে।

"''সহিষ্ণুতার আদর্শই আমাদের জীবনের ভিত্তি। আমি মনে করি না এখানে কোনো অসহিষ্ণুতার পরিবেশ রয়েছে। এখানে কারোরও ভীত হওয়ার বা নিপীড়িত হওয়ার ভয় নেই।''"

ভারতের প্রধান বিচারপতি টি এস ঠাকুর

হিন্দু বিদ্বেষে বিএনপি এবং আওয়ামি লিগের চরিত্রগত পার্থক্য নেই

বাংলাদেশের দিনাজপুরের কাহারোলে প্রায় তিনশো বছরের পুরনো কান্তজিউয়ের মন্দিরে জামাত-ই-ইসলামের সন্ত্রাসবাদীরা হামলা চালিয়েছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই প্রতিবেদন থেকে বোঝা যায় যে বাংলাদেশে আওয়ামি লিগের শাসনেও সেখানের সংখ্যালঘু হিন্দুরা মোটেই নিরাপদে নেই। খালেদা জিয়ার দল বিএনপি-র আমলে হিন্দুরা অকথ্য অত্যাচার ও নিপীড়নের মধ্যে দিন কাটিয়েছেন। বিএনপি এবং জামাতের যুক্ত শাসনকালে বাংলাদেশ সরকারের অঘোষিত নীতিই ছিল সেদেশ থেকে হিন্দুদের উৎখাত করে ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় আসার পর ভীত সন্ত্রস্ত হিন্দুদের মনে আশা জেগেছিল যে এবার তাঁরা নিরাপদে বাংলাদেশে বসবাস করতে পারবেন। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে শেখ হাসিনার সরকার জামাতের সঙ্গে যুক্ত মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারছে না। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিরাপত্তা নেই। এর একটা কারণ আওয়ামি লিগে জামাতের লোকজন ঢুকে পড়েছে। যেমন, পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসে সিপিএমের লুম্পেনরা আশ্রয় নিয়ে অবাধে সমাজবিরোধী কাজকর্ম করে চলেছে। মমতা সবই জানেন। কিন্তু বিধানসভার ভোটে দলের লুম্পেনরাই তাঁকে ফের মুখ্যমন্ত্রী করবে এই আশায় তিনি প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন।

বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায় ঘটা একটি ঘটনার উল্লেখ করলে বোঝা যাবে কেন আওয়ামি লিগের প্রধান শেখ হাসিনা কঠোর হতে পারছেন না। ফরিদপুরে গুহ মজুমদার পরিবারের বিশাল বসতবাড়ি 'দয়াময়ী ভবন' সম্প্রতি জবরদখল করেছেন ক্ষমতাসীন আওয়ামি লিগের প্রভাবশালী মন্ত্রী খোন্দকার মুশারফ হোসেন। বর্তমান মালিক অরুণ গুহ মজুমদারকে সপরিবারে উচ্ছেদ করেছে মন্ত্রীর অনুগত জামাতের গুণ্ডারা। মন্ত্রী খোন্দকার মুশারফ হোসেনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন ফরিদপুরের আওয়ামি লিগের হিন্দু নেতা সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায়। পরিণামে সত্যজিৎবাবুকে সপরিবারে ফরিদপুর ছেড়ে

গূঢ় পুরুষের কলম

পালাতে হয়েছে। তাঁর ৭০ বছর বয়সী বাবাকে মন্ত্রীর নির্দেশে জেলে পাঠানো হয়েছে। বাংলাদেশের ইংরাজি দৈনিক 'ডেলি স্টার' পত্রিকায় এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। প্রায় তিন একর জমির উপর দ্বিতল 'দয়াময়ী ভবনের' মূল্য বাংলাদেশের টাকায় ৭০ কোটি। কারণ তিনি শেখ হাসিনার একমাত্র কন্যার শ্বশুর। খোন্দকারকে বেআইনি কাজে বাধা দিলে কন্যারত্নটি শ্বশুরবাড়িতে বিপদে পড়তে পারে এই আশঙ্কায় হাসিনা হিন্দু সম্পত্তি জবরদখলে বাধা দেননি। তবে মন্ত্রী মশাই বিপদে পড়েছেন অন্য কারণে। খোন্দকারের প্রধান রাজনৈতিক সচিব আবুল কালাম আজাদ ওরফে 'বাচ্চু রাজাকার' মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ফরিদপুরে হিন্দু গণহত্যার প্রধান জল্লাদ ছিল। সম্প্রতি ঢাকার আন্তর্জাতিক ওয়ার ক্রাইম ট্রাইবুন্যালের বিচারে বাচ্চু রাজাকারকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। এরপরেই মন্ত্রী খোন্দকার সাহেব তাকে গোপনে বাংলাদেশ ছেড়ে পালাতে সাহায্য করে। এরপরেও খোন্দকারের মন্ত্রীত্ব টিকে আছে হাসিনার অনুগ্রহে।

বাচ্চু রাজাকার ফদিরপুরের এক নম্বর জামাত নেতা ছিল। এইরকম একজন মার্কামারা জামাতি কীভাবে আওয়ামি লিগের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীর প্রধান রাজনৈতিক সচিব হয়? এর থেকে বোঝা যায় হিন্দু বিদ্বেষে খালেদা জিয়ার বি এন পি এবং শেখ হাসিনার আওয়ামি লিগের চরিত্রগত পার্থক্য নেই। ঢাকার ডেলি স্টার পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৪৫টি জেলায় সংখ্যালঘু হিন্দুরা মৌলবাদীদের অত্যাচারে সন্ত্রস্ত হয়ে দিন কাটাচ্ছেন। এই ৪৫টি জেলায় ১২৮টি মন্দির ধ্বংস করা হয়েছে। কমপক্ষে ২৫৫টি হিন্দু পরিবারের বসতভিটায় অগ্নিসংযোগ করেছে জামাতের গুণ্ডারা। তাই বলছি, শেখ হাসিনার সরকার হিন্দুদের প্রতি সহানুভূতিশীল এমন ধারণা ভুল।

পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান ভোট পেতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে তোষণ নীতি নিয়েছেন সে সম্পর্কে স্বস্তিকার অনুরাগীরা যথেষ্টই অবহিত। তাই তার বিস্তারিত উল্লেখ অপ্রয়োজনীয়। শুধু এই তোষণ নীতি কতটা দূর যেতে পারে তার একটি উদাহরণ দেব। কলকাতার বাংলা স্টেটসম্যানের শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মানস ঘোষকে মমতার হুকুমে পত্রিকার পরিচালকরা বরখাস্ত করেছেন। সম্পাদকের অপরাধ তাঁর কাগজে মমতার নীতির সমালোচনা করে প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। মমতা চেয়েছিলেন স্টেটসম্যান ভবনের কাছেই টিপু সুলতান মসজিদের ইমামকে সম্পাদক করতে। ইমাম সাহেব বাংলা লিখতে পড়তে জানেন না তাই রাজি হয়নি। ইমাম সাহেব তাঁর এক বশংবদকে বাংলা স্টেটসম্যানের সম্পাদক করে দিয়েছেন। এরপরেই মমতা সরাতে চেয়েছিলেন ইংরেজি 'দ্য স্টেটসম্যানের' চিফ রিপোর্টার তরুণ গোস্বামীকে। অপমানিত হওয়ার আগেই তরুণবাবু পদত্যাগ করেন।

তাই বলছি শেখ হাসিনার বাংলাদেশে হিন্দুরা মৌলবাদী জামাতের শিকার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পশ্চিমবঙ্গেও হিন্দুরা নিরাপদ নয়।

অবস্থা এমন, হয় মুসলমান হতে হবে, নইলে দেশ ছাড়তে হবে : সন্ত লারমা

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চুক্তি সই হওয়ার পরও এখানে সেনাশাসন চলছে। শান্তি চুক্তির পরও কেন সেনাশাসন চলবে? পাহাড়ের ভূমি সমস্যার সমাধান না করে সেনাবাহিনীর ক্যাম্প, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও পর্যটনের জন্য নতুন নতুন ভূমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। শাসকগোষ্ঠী এই অঞ্চলের ইসলামিকরণ ও সামরিকীকরণ করছে। এই দুই কর্মসূচি চলতে থাকলে জুম্ম জনগণকে হয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হবে, না হয় দেশ ছাড়তে হবে। এভাবে প্রচণ্ড ক্ষোভ উগরে দিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (জেএসএস) সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্ত লারমা)। যিনি প্রায় দু'দশক পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন। শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে প্রথমবার ক্ষমতায় আসলে পরের বছর ২ ডিসেম্বর পার্বত্য শান্তি চুক্তি সই হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে অবসান হয় সশস্ত্র যুদ্ধের। এক্ষেত্রে নেপথ্যে সহায়তা করে ভারত। কিন্তু সেই সশস্ত্র সংগ্রামের নায়ক সন্ত লারমাকেই ১৮ বছর পর বলতে হচ্ছে, জুম্ম জাতির একজনও বেঁচে থাকলে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের জন্যে লড়াই করে যাবে। এছাড়া জুম্ম জাতির বেঁচে থাকার আর কোনো বিকল্প নেই। অন্যথায় জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। শান্তিচুক্তির ১৮ বছর পূর্তি উপলক্ষে গত ২ ডিসেম্বর রাঙামাটি শহরে আয়োজিত এক মহাসমাবেশে সন্ত লারমা একথা বলেন। তিনি অভিযোগ করেন, শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে সরকার সত্যি কথা বলছে না। চুক্তির কোন কোন ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে, আর কোন কোন ধারা বাস্তবায়িত হয়নি তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে এ বছরের এপ্রিল মাসে প্রধানমন্ত্রীর কাছে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো সাড়া মেলেনি। মূল ভূমি সমস্যারই সমাধান হয়নি। ভূমি হারিয়ে নিজ দেশে পরবাসী হয়ে গেছে আদিবাসীরা। সরকারের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ এনেছেন জনসংহতি নেতা।

এর আগে রাজধানী ঢাকায় বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম আয়োজিত এক আলোচনা সভায় সন্ত লারমা প্রশ্ন করেন, আজ দেখা যাচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী-বাঙালি (মুসলমান) প্রায় সমান সমান হয়ে গেছে। কিন্তু এত দ্রুত পাহাড়ের এই সংখ্যাগত পরিবর্তনের কারণ কি? রাজনৈতিক কারণেই কি এই পরিবর্তন করা হয়েছে?

এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, ১৯৪৭ সালে দেশভাগের মাধ্যমে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে অমুসলমানদের হার ছিল ৯৭ দশমিক ৫ শতাংশ। মুসলমান ছিল মাত্র ২ দশমিক ৫। বর্তমানে এই হার দাঁড়িয়েছে অমুসলমান ৪৮ শতাংশ। মুসলমান ৫২ শতাংশ। আর একটি পরিসংখ্যান, যদিও আংশিক। ১৯৪৭ সালে গোটা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে (রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলা) মসজিদের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি। নরওয়ের ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্ক গ্রুপ ফর ইন্ডেজেনাস এফেয়ার্স (আই ডব্লিউ জি আই এ) ২০০২ সালে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছিল, শুধুমাত্র খাগড়াছড়িতেই ওই সময় পর্যন্ত মসজিদের সংখ্যা দাঁড়ায় তিনশ'র ওপরে। এর পর পার্বত্য অঞ্চলে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি প্রায় নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কয়েকদিন আগে এক আলোচনা সভায় বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমানও পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপকভাবে মসজিদ-মাদ্রাসার উপস্থিতির কথা বলেন।

আসলে পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় (বলা যেতে পারে সেনাবাহিনীর সক্রিয় তত্ত্বাবধানে) অমুসলমান নাগরিকদের হটিয়ে অন্যান্য জেলার মুসলমানদের এনে পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া শুরু হয় জেনারেল জিয়াউর রহমানের আমলে। সেই সত্তরের দশকের শেষ দিকে। জিয়া যখন দেখলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে মুসলমান তেমন নেই, মসজিদ নেই, দাপট বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের, তিনি সেখানে ভূমি থেকে অমুসলমানদের হটিয়ে মুসলমানদের বসানোর সিদ্ধান্ত নেন। মূলত ইসলামিকরণের সূচনা হয় জিয়ার হাত ধরে। পরবর্তীকালে জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ও জিয়াপত্নী খালেদার আমলে এই পরিকল্পনা আরও গতি লাভ করে। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয়, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির নেত্রী শেখ হাসিনার আমলে এই গতি অব্যাহত থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিস্তীর্ণ ভূমি এখন পার্বত্য এলাকার বাইরে থেকে আগত মুসলমানদের হাতে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয়ভাবে নিগৃহীত অমুসলমানরা। যে অসন্তোষের প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা সন্ত লারমার কণ্ঠে। শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর শান্তি চুক্তি সই হয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের অমুসলমানদের অনেকেই মনে করেন, মূলত সশস্ত্র লড়াই বন্ধ করতেই শান্তি চুক্তি করা হয়েছিল। পাহাড়ি মানুষগুলো প্রতারিত হয়েছে। চুক্তির ১৮ বছরেও হারানো ভূমি ফিরে পায়নি আদিবাসীরা। শেষ পর্যন্ত পাহাড়িরা অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দিয়ে আগামি ১ জানুয়ারি থেকে ১০ দফা নতুন কর্মসূচি দিয়েছে। এই কর্মসূচিতে রয়েছে, সরকারের দালালদের বর্জন, চুক্তি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের জন্যে হরতাল, যোগাযোগ অবরোধ, অর্থনৈতিক অবরোধ, পর্যটনের বিরোধিতা, আদালত বর্জন, সরকারি ও আধা-সরকারি অফিস বর্জন, নিজস্ব আদালতে বিচার, ছাত্র ধর্মঘট, শান্তিচুক্তির বিরোধীদের প্রতিরোধ ও অবৈধভাবে ভূমি জবরদখলকারীদের প্রতিহত করা।

প্রতিবাদ গণতন্ত্রে জরুরি তবে তা নিরপেক্ষ ও গঠনমূলক হওয়া উচিত

সমর কুমার বোস

কিছুদিন ধরে দেশের নানা প্রান্তে একের পর এক লেখক সাহিত্যিক ও চিত্র পরিচালক তাঁদের প্রাপ্ত পুরস্কার ফেরত দিয়ে চলেছেন। এঁদের বক্তব্য হলো দেশে বর্তমানে যে হিংসার পরিবেশ তৈরি হয়েছে যার ফলস্বরূপ কন্নড় লেখক এম এম কালবুর্গী ও দাদরিতে আকলাখের হত্যা হয়েছে। আবার কিছু লোকের বক্তব্য হলো মোদীর জামানায় ভারতের গণতান্ত্রিক পরিসর বিঘ্নিত হচ্ছে ও বহুত্ববাদী সংস্কৃতির উপর যেভাবে গেরুয়া প্রভাব আরোপিত হচ্ছে তার প্রতিবাদে তারা এরূপ করছেন।

মূলত এম এম কালবুর্গী ও আকলাখের হত্যার পরই লেখক, সাহিত্যিক, চিত্র পরিচালক ও শিল্পীদের প্রতিবাদ স্বরূপ পুরস্কার ফেরত দেবার হিড়িক পড়ে যায়। কালবুর্গীর হত্যার পর প্রাথমিক ভাবে কিন্তু পুরস্কার ফেরতের হুজুগ দেখা যায়নি। প্রতিবাদের ঢল শুরু হয় অক্টোবরের প্রথম দিকে, যদিও কালবুর্গীর হত্যা হয় ৩০ আগস্ট। যখন দুই সাহিত্য তারকা অশীতিপর নয়নতারা সহগল (জওহরলাল নেহরুর ভাগ্নি) ও অশোক বাজপেয়ী পুরস্কার ফেরালেন এবং তার দু'দিন পরে ফেরালেন সাহিত্যিক কৃষ্ণা সোবাতি ও শশী দেশপাণ্ডে। তারপর অনেকে তাঁদের পথ অনুসরণ করেছেন। তবে এখন প্রতিবাদের ঘটনাক্রম দেখে মনে হচ্ছে এটা একটা পরিকল্পিত, সংগঠিত রাজনৈতিক প্রতিবাদ। প্রতিবাদের ধরন দেখে মনে হচ্ছে যে এরা প্রতিবাদ ছাড়া আরও কিছু বলতে চাইছেন হয়তো যা আমাদের বুঝে নিতে হবে। ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে এরকম অবস্থা কি আসেনি? আর এর মধ্যে নরেন্দ্র দাভোলকর ও গোবিন্দ পানসারের হত্যা হয়েছে ইউপিএ আমলে। এছাড়া ইউ.পি.এ আমলেই অধ্যাপক টি.জে. জোসেফের ডান হাতের তালু কব্জি সমেত কেটে নিয়েছিল র‍্যাডিক্যাল মুসলমান সংগঠনের সদস্যরা, তিনি নাকি হজরত সম্বন্ধে কটুক্তি করেছিলেন। এবং যখন হাসপাতালে তিনি একটু ভাল হয়ে ওঠেন তখন তাঁকে কলেজ থেকে বরখাস্ত করা হয় (৪ জুলাই ২০১০)।

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যমগ্রামে বিহারের সমস্তিপুরের যে কিশোরী দু'বার গণধর্ষিতা হয়, তার পরিবার বাধ্য হয়েছিল এয়ারপোর্টের কাছে বাড়ি ভাড়া করে থাকতে কিন্তু সেখানেও রক্ষা পায়নি সে, অভিযুক্তরা তাকে তাঁর বাড়িতে পুড়িয়ে মেরেছে বলে অভিযোগ। তার বাবা-মা রাজ্য ছেড়েই চলে গেছে।

এতসব ঘটনা কিন্তু এন ডি এ আমলে বা বিজেপি শাসিত রাজ্যে হয়নি। কিন্তু ওইসব ঘটনার বিরুদ্ধে কোনো সাহিত্যিক, চিত্র পরিচালক, শিল্পী বা বুদ্ধিজীবী তাঁদের প্রাপ্ত সম্মান ফেরত দিয়েছে বলে শোনা যায়নি। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ভারতে অনেক দুঃসময় এসেছে যা আমাদের হৃদয়ে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে যেমন— ১৯৭৫ সালে এমারজেন্সি ঘোষণা করে সব বিরোধী নেতাদের জেলবন্দি করা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা— গণতন্ত্রের পক্ষে এর থেকে দুঃসময় আর আসেনি।

১৯৮৪ সালের ২ নভেম্বর ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার পর সারা দেশে ২০০০ থেকে ২৫০০ শিখকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়, সম্পত্তি পোড়ানো হয়, লুঠ হয়। ১৯৯০ সালে প্রায় ৪ লক্ষ হিন্দু পণ্ডিতদের মুসলমান উগ্রপন্থী দ্বারা কাশ্মীর থেকে বিতাড়িত করা হয়, নির্বিচারে হত্যা করা হয়, ধনসম্পত্তি লুঠ করা হয়। আজও তারা জম্মু ও দিল্লীর ত্রাণ শিবিরে ও কিছু অন্যত্র বসবাস করছে। নিজেদের দেশেই তারা উদ্বাস্তু। ২৫ বছর হয়ে গেল কিন্তু কোনো সরকার তাদের ফেরাবার কোনো ব্যবস্থাই করেনি। এছাড়াও ভাগলপুরের দাঙ্গা, সমঝোতা ব্লাস্ট ও আরো অনেক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। আমরা কিন্তু শুনিনি কোনো লেখক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, শিল্পী ও চিত্র-পরিচালক তাঁদের প্রাপ্ত সম্মান ফেরত দিয়ে প্রতিবাদ করেছেন।

সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে এই পুরস্কার ফেরতের পিছনে কেবল প্রতিবাদই নয় অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে এবং সেটাই মুখ্য। দেশের মানুষ মোদীজীর নেতৃত্বে বিজেপিকে সারা ভারতে বিপুল সমর্থন দিয়ে ক্ষমতায় এনেছে এবং কংগ্রেস-সহ আঞ্চলিক দলগুলিকে দুর্বল করে দিয়েছে আর বামপন্থী দলগুলি যেন কর্পূরের মতো উবে গেছে সারা দেশ থেকে। যার ফলস্বরূপ বাম-কং দুজনে মিলে তাদের পৃষ্ঠপোষক লেখক, সাহিত্যকার, চিত্র পরিচালক, ইতিহাসবিদ সবাইকে সামনে রেখে কৌশলগত ভাবে সংগঠিত রূপে মোদীজীর বিরুদ্ধে আদাজল খেয়ে লেগে পড়েছে। আর এর ফলে দেশের ছবি কেবল দেশেই নয় দেশের বাইরেও খারাপ হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এদের ক্রমাগত প্রতিবাদের ফলে দেশে প্রতিবাদের মহল তৈরি হবে, লেখালেখি হবে, বিতর্ক হবে আর ঠিক এইজন্য সাধারণ জনগণের কাছে মনে হবে অসহিষ্ণুতার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে আর তা দেখে বাম-কং পর্দার অন্তরাল থেকে মজা লুঠবে। এই কিছুদিন পূর্বেও খৃষ্টানদের উপর আক্রমণকে মুদ্দা করে পরিস্থিতিকে বিষাক্ত করার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু মোদীজীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছে। কিন্তু এবার এরা ক্রমাগত প্রচার চালিয়ে দেশের বাইরে ব্র্যান্ড ইন্ডিয়ার পায়ে শিকল পরাতে চাইছে। ইতিমধ্যে আমরা জানতে পেরেছি যে ব্র্যান্ড ভ্যালুর রেটিং-এ ভারতের স্থান পৃথিবীতে সপ্তম। সারা বিশ্বে এর চাহিদা বেড়েই চলেছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক-এর রেটিং-এ ব্যবসা আরম্ভের সুবিধার নিরিখে ভারতের স্থান ১৩০ নম্বরে— গত বছর যা ছিল ১৩৪ নম্বরে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কিছু বিরোধী দল আমজনতার

ভোট না পেয়ে পাকিস্তানের মতো সামনা-সামনি যুদ্ধে পারবে না বলে পর্দার অন্তরালে থেকে আক্রমণ করে চলেছে। আর এর ফলস্বরূপ দেশে অসহিষ্ণুতার পরিবেশ তৈরি হচ্ছে আর তার প্রভাব পড়ছে আন্তর্জাতিক স্তরে। এই প্রবন্ধ যখন শেষ করতে যাচ্ছি তখন পর পর দুদিন ইরফান হাবিব মহাশয়ের ইন্টারভিউ টিভি ও টাইমস অফ ইন্ডিয়ার মারফত জানতে পারলাম। রোমিলা থাপার, বি ডি চট্টোপাধ্যায়, উপিন্দর সিং, ডি এন ঝা ও ইরফান হাবিব— এরা একটি সম্মিলিত স্টেটমেন্ট দিয়ে দেশে অস্থির পরিস্থিতি সম্বন্ধে চিন্তা প্রকট করেছে। কিন্তু ইরফান হাবিবের বক্তব্য তো আমাকে বিশেষ ভাবে চিন্তিত ও দুঃখিত করেছে। তিনি বলেছেন— India is turning into a mirror image of Pakistan under RSS rule। এই ব্যক্তিকে আমরা ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিজীবী বলে জানি। কিন্তু উনি ভারতবর্ষের ১০০০ বছরের ইতিহাস সম্বন্ধে কি কিছুই জানেন না বা স্বাধীনোত্তরকালে পাকিস্তানের ভূমিকা বা পাকিস্তান ও বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান জনসংখ্যার পরিবর্তন ও তার কারণ সম্বন্ধে কি কিছুই জ্ঞান নেই। স্বাধীনোত্তর ভারতে যত দাঙ্গা হয়েছে তার সম্বন্ধে কি কোনো ধারণা নেই। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জন্ম ১৯২৫ সালে, তারপর অনেক দাঙ্গা হয়েছে এবং অনেক দাঙ্গা কমিশনও হয়েছে। আমি তাঁকে অনুরোধ করব সেগুলো একবার ভালো করে দেখে নিতে। সেগুলো সবই কংগ্রেস আমলে হয়েছে। ১৯৭৫ সাল থেকে আমি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সঙ্গে আছি এবং কখনও সঙ্ঘের মধ্যে অন্য ধর্ম সম্বন্ধে অশ্রদ্ধার ভাব দেখিনি।

কিন্তু আমরা দেখেছি 'স্যাটানিক ভারসেস' লেখার পর আয়াতোল্লা খেমেইনি সলমন রুশদিকে মৃত্যু দণ্ড দিয়েছিল এবং বইটি ভারতে আসবার পূর্বেই নিষিদ্ধ হলো। অথচ যখন তসলিমা নাসরিনকে বাংলা থেকে বের করে দেওয়া হলো তখন কিন্তু এই ধরনের জয়েন্ট স্টেটমেন্ট আমরা দেখতে পাইনি।

সারা পৃথিবীর দিকে তাকালে দেখা যায় ও বোঝা যায় যে অসহিষ্ণুতার বা হিংসার বাতাবরণ কোথা থেকে তৈরি হচ্ছে। চরম অসহিষ্ণুতার ভয়ঙ্কর আবহাওয়া কোথায় কোথায় হচ্ছে এবং কোন বিশেষ মতাবলম্বীরা এর নেপথ্যে তা আমরা ইলেকট্রনিক মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া, ফেসবুক বা হোয়াটস অ্যাপের মাধ্যমে সবই জানতে পারছি আর আমাদের কাছে এদের আনুগত্য সম্বন্ধে ধারণাও মজবুত হচ্ছে। আমরা জানি সারা বিশ্বে যেসব আতঙ্কবাদী কার্যকলাপ চলছে মূলত তার উৎপত্তি বিশেষ ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে কিন্তু তাদের সম্বন্ধে একটি কথাও এদের মুখ থেকে বেরোয় না। এদের শিল্পীরা সরস্বতীর নুড ফিগার আঁকে— আল্লার নয়। এদের কার্যকলাপ দেখে সুরদাসের একটি পদ মনে পড়ছে— 'সুরদাস মন কারি কমরিয়া চঢ়ত ন দুজা রঙ।' অর্থাৎ সন্ত কবি সুরদাস নিজের মনকে এমন কৃষ্ণ প্রেমে রাঙিয়েছিলেন যে সেখানে অন্য রং ধরতো না। সাম্প্রতিক ঘটনাবলি দেখে মনে হচ্ছে যে এরাও বিশেষ রং-এ এদের মনটাকে এমন রাঙিয়েছেন যে সেখানে অন্য রং আর ধরানো যাবে না।

আর এই প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে ঐতিহাসিকদের গবেষণালব্ধ বিবৃতির কথা না লিখে পারছি না। তা হলো ২০০৩ সালে অক্টোবরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভারসিটিতে 'The rise of Civilization in the greater Indus and Saraswati Valley' শীর্ষক এক সম্মেলন হয়। সেখানে যোগ দেন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় বংশোদ্ভূত অধ্যাপক ডি আর সরদেশাই ও পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইহসান আলি। তাঁদের সঙ্গে আরো ছিলেন হরপ্পা অঞ্চলের গবেষণায় দীর্ঘকাল নিযুক্ত ড. ব্রায়ান হেমফিল, অধ্যাপক জোনাথন মার্ক কেনোয়ের ও ড. রিচার্ড মিডো-সহ অনেক ঐতিহাসিক। তাঁরা তাদের গবেষণালব্ধ তথ্যে একমত হয়ে বিবৃতি দেন, আর্যজাতির আদি ভূমি মধ্য এশিয়ায় নয়, তা ছিল ভারতে সিন্ধু-সরস্বতী নদীর তীরবর্তী ভূমিতে। তাঁদের ভাষা বৈদিক সংস্কৃত এবং সংস্কৃত হলো পৃথিবীর প্রাচীনতম পূর্ণ বিকশিত ভাষা।

ভারতে আর্য আক্রমণ তত্ত্ব ভুল এবং তাঁরা মত প্রকাশ করেন এই ভুল তথ্য কোনো পাঠ্যপুস্তকে থাকা অনুচিত ও সবারই উচিত এ সত্য প্রকাশে যত্নবান হওয়া। আর্য শব্দটি ব্যবহৃত হয় সভ্য, সজ্জন, পূজ্য ও শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি গুণকে বোঝাতে— কোনো জাতিকে বোঝাতে নয়। কিন্তু এটা সত্য হলেও এইসব ঐতিহাসিকরা কখনও জয়েন্ট স্টেটমেন্ট দিয়ে এই ঐতিহাসিক সত্যকে পাঠ্যপুস্তকে লিপিবদ্ধ করার কোনো দাবি করেছেন বলে আমার মনে পড়ে না। আমার কাকিমা বলতেন, চালন বলে সূঁচকে তোর পিছনে একটা ফুটো— এদের অবস্থা ঠিক তাই।

সারা বিশ্বে যখন ভারতের সুনাম বাড়ছে, ইউ এন ও যখন ভারতীয় যোগাসনকে স্বীকৃতি দিয়ে ২১ জুনকে বিশ্ব যোগদিবস ঘোষণা করেছে, মোদীজীর প্রচেষ্টায় বিশ্বের বেশির -ভাগ দেশে যখন তার অনুশীলন হচ্ছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির সেটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রের জন্য গীতার অংশবিশেষ আবশ্যিক পাঠক্রম করা হয়েছে, যখন ব্র্যান্ড ইন্ডিয়া পৃথিবীতে খুব জনপ্রিয় হচ্ছে, যখন বিশ্বে ভারতের মর্যাদা ও শক্তি বাড়ছে তখন দেশেরই কিছু রাজনৈতিক নেতা ভারতীয় যোগাসনকে জন্তু-জানোয়ারের অঙ্গ সঞ্চালনের সঙ্গে তুলনা করছে। দেশে অসহিষ্ণুতার ব্যানারে ক্রমাগত বলে বলে পরিবেশকে বিষিয়ে তুলছে। স্বাধীনতার দীর্ঘ ৬৮ বছর পর বিজেপির এরকম সুইপিং মেজরিটি তাদের পায়ের তলার জমি কেড়ে নিচ্ছে, তাতেই তারা অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে এবং যেনতেন প্রকারে এদের ঠেকাবার জন্য হিংস্র হয়ে উঠছে। ভারত পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র। এত বড় দেশে ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ঘটনা হবেই, তার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে হবে। ভারতে কখনও অসহিষ্ণুতা ছিল না এবং হিন্দুরা কখনই অসহিষ্ণু নয়। এদের প্রতিবাদ কার্যকলাপেই অসহিষ্ণুতার পরিবেশ তৈরি হচ্ছে যা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত।

বিবেকানন্দের ভাষায় ভারতবর্ষ সেই দেশ যেখানে পৃথিবীর সকল ধর্মের ও সকল জাতির নিপীড়িত ও আশ্রয়প্রার্থী জনগণকে চিরকাল আশ্রয় দিয়ে এসেছে। রোমের অত্যাচারে ইহুদিরা ভারতে এসে শান্তির আশ্রয় পেয়েছিলেন। জরথুষ্ট্রের শেষ অনুগামী পার্শীরা ভারতে এসে লালিত পালিত হয়েছে কিন্তু মহম্মদ ও খৃষ্টের অনুগামীরা আমাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছে যা ইতিহাসের পাতায় রক্ত দিয়ে লেখা আছে। ■

ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে এত হৈচৈ কেন ?

২৬ নভেম্বর ২০১৫ দিল্লীতে সংসদের অধিবেশনে 'সংবিধান দিবস' পালনের স্বপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার সাংসদদের কাছে আহ্বান জানালেন। আজ থেকে ছয় দশক আগে ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর ভারতীয় সংবিধান অনুমোদিত হয়। ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার আধার হলো সংসদীয় গণতন্ত্র আর এই গণতান্ত্রিক শাসনের ভিত্তি হলো সংবিধান। সংবিধানের নিয়মবিধি প্রতিপালনের অঙ্গীকার নিয়ে প্রধানমন্ত্রী থেকে মন্ত্রিসভার সদস্যগণ ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা শপথ বাক্য পাঠ করেন। কিন্তু এমন দৃষ্টান্ত ভুরি ভুরি দেখানো যায় যে সংবিধানের নামে শপথ নিয়ে অসাংবিধানিক কাজে অনেকেই লিপ্ত হন। দুর্নীতি, দলীয় রাজনীতির দাপট, ভোটচুরি, ধর্ষণ এ সমস্তই গণতন্ত্র বিরোধী এবং এক কথায় অসাংবিধানিক। এর সঙ্গে রয়েছে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ যা জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক। আইনের শাসন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা সুনিশ্চিত না হলে গণতান্ত্রিক শাসন প্রহসনে পরিণত হয়। আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসীরা বিগত চার দশকের অভিজ্ঞতায় দেখছি যে পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন তলানিতে এসে ঠেকেছে। রক্ষক ভক্ষকের ভূমিকায় নেমেছে। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মের আধারে ব্যক্তিজীবন ও সমাজ জীবনের পারস্পরিক বিকাশের কথা ব্যক্ত করেছিলেন। অনবদ্য ভাষায় তিনি লিখেছিলেন ''স্বজাতির স্বার্থে নিজের স্বার্থ, স্বজাতির কল্যাণে নিজের কল্যাণ।'' প্রাচীনকালেই রাষ্ট্র পরিচালনায় নৈতিক অনুশাসনের কথা বলা হয়েছে। 'সত্যমেব জয়তে' আদর্শের প্রতি স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় বিধানে প্রত্যয় উচ্চারিত হয়েছে।

দুঃখের কথা সংসদে বিরোধী দলগুলি জাতীয় বিকাশ, সামাজিক সংহতি, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা এসব বিষয়ে আদৌ চিন্তিত নন। এদের মূল লক্ষ্য বহুত্ববাদের নামে বিচ্ছিন্নতাবাদকে আকারে ইঙ্গিতে পরিপুষ্ট করা। আর কে না জানে ভারতে বৃটিশ শাসকদের দুটি মূল লক্ষ্য ছিল--- (১) ভারতের ধর্ম ও সমাজের গলদ ও কুসংস্কারগুলিকে জনসমক্ষে তুলে ধরা এবং এর মাধ্যমে পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করা, (২) ভারতের জাতপাত, আঞ্চলিকতা ও ধর্মীয় বিভিন্নতাকে পরিপুষ্ট করা। সাম্রাজ্যবাদী বিভেদপন্থী কৌশল বাজিমাৎ করতে সক্ষম হয়। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে চিড় ধরে এবং দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পৃথক পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়। আর অন্যদিকে হিন্দু সমাজকে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ (তপশিলী) দুটি পৃথক গোষ্ঠীতে বর্গীকরণ করে। প্রথমটির পরিণতি হলো মুসলিম লীগের 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' হুঙ্কার আর দ্বিতীয় কৌশলটি সফল না হলেও রাজনীতিতে নিম্নবর্গীয় গোষ্ঠীর মনে পৃথক স্বাতন্ত্র্যবোধের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে।

স্বাধীনতার পর ভারতীয় সংবিধানে এই দুটি সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ধর্মকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। আর ধর্মীয় স্বাধীনতার রক্ষাকবচ নেওয়া হলো। তপশিলী জাতি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণের বিধান ঘোষিত হলো। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন ভারত বহু ধর্মাবলম্বীর দেশ। তাই কোনো একটি ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রের পক্ষপাতিত্ব থাকা অনুচিত। এই জন্যই ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ বলা হয়েছে। এই ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হলো সব ধর্মের প্রতি সমদৃষ্টি। সামাজিক ন্যায় বিচারের বিষয়টিও যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে।

লোকসভায় ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে বক্তব্য রাখছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং।

সংবিধানের ৩৪১ ও ৩৪২ ধারায় অনুন্নত শ্রেণীকে সমাজের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সমমর্যাদায় বসানো হয়েছে। আসলে গোড়া থেকেই ভারতীয় সংবিধান এক প্রগতিশীল জনকল্যাণমুখী শাসনবিধির রূপরেখা রচনা করেছিল। কিন্তু জরুরী অবস্থার সময় ১৯৭৬ সালে সংবিধানের ৪২তম সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের মূল প্রস্তাবনায় সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ শব্দ দুটি যুক্ত করা হয়। গণতান্ত্রিক শাসন সংহার করে জরুরি অবস্থায় এই দুটি শব্দের সংযোজন ছিল নেহাতই রাজনৈতিক চমক।

ধর্মীয় বিবর্তন :

বিশ্বের প্রাগৈতিহাসিক যুগে কোনো প্রথাগত ধর্ম ছিল না। খৃষ্টপূর্ব ১০ হাজার নাগাদ নব্য প্রস্তর যুগের সূচনা হয় এবং কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির সুবাদে সুসংহত সমাজ জীবন গড়ে ওঠে। বিশ্বে ধর্মীয় ব্যবস্থার বিবর্তনে তিনটি পর্ব চোখে পড়ে। প্রথমে গড়ে ওঠে প্রকৃতি, জীবজন্তুর উপাসনা। এরপর বহু ঈশ্বরবাদী পর্বের সূচনা হয়। এর অর্থ হলো বহু ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও তাদের উপাসনা। বহু ঈশ্বরবাদে মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর একটি কোনো বিশেষ দেবী বা দেবতার কৃপা থাকে। প্রাচীন মিশর, সিরিয়া, গ্রীস, রোম, চীন ও ভারতে বহু ঈশ্বরবাদী ধর্ম ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। এরপর একেশ্বরবাদী ধর্ম ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। অভ্যুদয় হয় একেশ্বরবাদী ধর্মের। ইহুদি, খৃষ্টানধর্ম ও ইসলাম একেশ্বরবাদী ধর্মের প্রধান দৃষ্টান্ত।

হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা হলো যে এই ধর্ম পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী ও বহু ঈশ্বরবাদের অনুগামী। এই প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র পালের বক্তব্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি বিশ্বের ধর্মগুলিকে জাতিগত ও একেশ্বরবাদী এই দুটি বর্গে বিভক্ত করেছেন। প্রথম ধরনের ধর্ম হলো সহজাত, একটি অঞ্চলের সমাজ ও সংস্কৃতি এই ধর্মে প্রতিফলিত হয়। আর দ্বিতীয় ধরনের ধর্ম তিনটি সূত্রের উপর বিন্যস্ত। এইসব ধর্ম অবতারবাদী, একটি বিশেষ ধর্মগ্রন্থের অনুশাসন দ্বারা পরিচালিত আর নিজ ধর্ম সম্প্রসারণ করতে আগ্রহী। খৃষ্টান ও ইসলাম ধর্মে এমনটাই দেখা যায়। খৃষ্টান ধর্মের অবতার হলেন যীশুখৃষ্ট, ধর্মগ্রন্থ হলো বাইবেল আর খৃষ্টান ধর্ম প্রথমে রোমান সাম্রাজ্যে, তারপর ইউরোপ মহাদেশে ও পরিশেষে উপনিবেশ বিস্তারের পাশাপাশি বিশ্বের অন্যত্র খৃষ্টধর্মের প্রসার ঘটে। অন্যদিকে ইসলাম ধর্মের উন্মেষ ঘটে আরবে। হজরত মহম্মদ ও কোরান এই ধর্মের অবতার (নবি) ও ধর্মগ্রন্থ। প্রথমে পশ্চিম এশিয়া, পরে ইরাক ও ইরান, মধ্যএশিয়া, উত্তর আফ্রিকা এমনকী ইউরোপের স্পেনে ইসলাম ধর্ম প্রসারিত হয়। ইসলাম জগতের প্রধান হলেন খলিফা। বিশ্বের ইসলামীয় রাষ্ট্রগুলি খলিফার নিয়ন্ত্রণ মেনে নেয়। এইভাবে বিশ্বজনীন খিলাফত গড়ে ওঠে।

এরপর শুরু হলো দুই একেশ্বরবাদী ধর্মের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই। মধ্যযুগে ইউরোপে রাজনীতির উপর ধর্মের (religion) দাপট চরমে ওঠে। পোপতন্ত্র নিরঙ্কুশ

> “ভারতে বিভিন্ন দলের ‘সেকুলারিজম’ নিয়ে বিতর্ক আত্মপ্রবঞ্চনা বলে মনে হয়। তাঁরা পাশ্চাত্য সেকুলার রাষ্ট্রের সমর্থক নন, কেননা তাহলে ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যবধান গড়ে তুলতে হবে। আর অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (Uniform Civel Code) নিয়ে টুঁ শব্দ করব না, অথচ সেকুলারিজম বলে হৈচৈ করব, এতো এক ধরনের দ্বিচারিতা।”

ক্ষমতা কুক্ষিগত করল। পোপের নির্দেশে শুরু হলো দীর্ঘকাল ধরে ক্রুশেড বা ধর্মযুদ্ধের রক্তস্নাত অধ্যায়। এখানেই শেষ নয়। ইউরোপ মহাদেশে খৃষ্টধর্ম দুটি প্রতিপক্ষ শিবিরে ভাগ হয়ে পড়ল। ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্টদের মধ্যে দীর্ঘ সংঘাতে ইউরোপের রাজনীতি ক্লেদাক্ত হয়ে উঠল। গড়ে উঠল শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্র। ধর্ম বা religion-কে রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে বিযুক্ত করে ধর্ম বিবর্জিত পার্থিব রাষ্ট্র-এর উন্মেষ ঘটল। এভাবেই সেকুলার রাষ্ট্রব্যবস্থার সূচনা হলো।

আধুনিককালে সেকুলার রাষ্ট্র ধর্ম অর্থাৎ নৈতিক ও মানবিক অনুশাসনের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে এক যান্ত্রিক দানবীয় অবয়ব ধারণ করল। অন্যদিকে রাশিয়ায় কমিউনিস্ট শাসনে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হলো। রাজনীতি নির্দয় অমানবিক আসুরিক চরিত্র ধারণ করায় ব্যক্তিস্বাধীনতা ও বিশ্ব মানবিকতা বিধ্বস্ত হয়। বিশ শতকে দুই মহাযুদ্ধের সময় ''হিংসায় উন্মত্ত'' পৃথিবী লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ 'সভ্যতার সঙ্কট' লিখেছিলেন। এই 'সভ্যতার সঙ্কট' এখন আই. এস. পরিচালিত ইসলামীয় জঙ্গী সন্ত্রাসবাদের তাণ্ডবে নবকলেবরে পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষতা ও দ্বিচারিতা :

এই প্রেক্ষাপটেই ভারতে বিভিন্ন দলের 'সেকুলারিজম' নিয়ে বিতর্ক আত্মপ্রবঞ্চনা বলে মনে হয়। তাঁরা পাশ্চাত্য সেকুলার রাষ্ট্রের সমর্থক নন, কেননা তাহলে ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যবধান গড়ে তুলতে হবে। আর অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (Uniform Civel Code) নিয়ে টুঁ শব্দ করব না, অথচ সেকুলারিজম বলে হৈচৈ করব, এতো এক ধরনের দ্বিচারিতা। ভারতে 'সেকুলারিজম' পাশ্চাত্য ধাঁচে ধর্ম বিবর্জিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা নয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং সঠিক মন্তব্য করেছেন, ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা 'পন্থ নিরপেক্ষতা'। কোনো একটি ধর্মের প্রতি সহানুভূতি ও তোষণ এই 'পন্থ নিরপেক্ষতা'র লঙ্ঘন।

ইসলামীয় সন্ত্রাসবাদের ঘনঘটায় যখন তমসাচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, সে সময় 'মেকি সেকুলারিজম' এর ধূয়ো তুলে দেশের সুস্থিতি বিপন্ন করার এক ঘৃণ্য কৌশল সহজেই অনুষ্ঠিত হয়। সম্প্রতি গার্ডেনরীচে তিনজন পাকিস্তানের আই এস আই-এর চরকে ধরা হয়েছে। তার একজন শাসকদলের ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত আর একজন শাসকদলের শ্রমিক সংগঠনের আঞ্চলিক নেতা। প্রশ্ন উঠতেই পারে দেশ-বিরোধী চক্রীদের অনেকে কেন শাসকদলের ছত্রছায়ায় আশ্রয় পায়? রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তর কি কিছুই জানেন না যে খোদ কলকাতার বুকে এমন কাণ্ড ঘটছে? আবার দেখুন, সেকুলারিজিমের অভিভাবক নামে পরিচিত কংগ্রেস ১৯৮৮ সালে মুসলমান মৌলবাদীদের চাপে সলমন রুশদির 'সাটানিক ভার্সেস' নিষিদ্ধ করে দেয়। শাহবানু মামলার পরিণতি সকলের কাছেই পরিচিত। তসলিমা নাসরিন-এর প্রতি অমানবিক আচরণ কি ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? কাশ্মীরে পণ্ডিতদের বিতাড়নের সময় ধর্মনিরপেক্ষতার স্বঘোষিত ধ্বজাধারীরা মুখ খোলেননি কেন? এইসব দৃষ্টান্ত থেকে প্রমাণিত হয় ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে সোচ্চার হলেই ধর্মনিরপেক্ষতা সুনিশ্চিত করা যায় না। আচার আচরণে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রমাণ দিতে হবে। তথাকথিত একপেশে ধর্মনিরপেক্ষতা সুনিশ্চিত করার জন্য বিগত ইউপিএ সরকার ২০১১ সালে Prevention of Communal and Targeted Violence বিল আনতে চেয়েছিলেন। এর লক্ষ্য ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠদের সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণ। শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠদের নিয়ন্ত্রণ করাই বিলের লক্ষ্য ছিল। এমনকী সংখ্যালঘুদের জেহাদি সন্ত্রাসবাদী অপরাধ এই বিলের আওতায় ছিল না। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সংখ্যালঘু তোষণের ভণ্ডামি এই বিলে প্রতিফলিত হয়।

হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি ঃ প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার ঐতিহ্য :

ভারত হিন্দুস্থান নামে পরিচিত। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ভূখণ্ডে যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির সূচনা ও প্রসার ঘটেছিল তা হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত হয়। ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের মতো অন্যদের নিধন করে এই ধর্মের প্রসার ঘটেনি। এই ধর্মে 'উম্মা' 'জেহাদ', মুজাদ্দিন নেই অথবা পোপতন্ত্রের মতো কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণবাদী কাঠামো নেই। সহজাত সাবলীল প্রবহমান ধারায় হিন্দুধর্ম সঞ্জীবিত। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, সহনশীলতা ও সমন্বয়ের দিকগুলি হিন্দুধর্মের আঙ্গিকে প্রতিভাত। রবীন্দ্রনাথের ভারততীর্থ কবিতায় এর মর্মবাণী ধ্বনিত হয়েছে। বিবেকানন্দের ভাষায় মানুষের মধ্যে দেবত্ব বিদ্যমান। এই দেবত্বের সন্ধান হিন্দু দর্শনের মূল কথা। হিন্দুধর্মের বহুত্ববাদী উপাসনা পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষ নিজ নিজ দেবদেবীর উপাসনা করতে পারে। নিয়ন্ত্রণবাদের বেষ্টনীতে তাকে আবদ্ধ করা যায় না। গ্রীস ও রোমের বহুত্ববাদী ধর্ম কালের স্রোতে বিলুপ্ত হলেও ভারতে হিন্দুধর্ম এক প্রবহমান ধারা। ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বনিয়াদ এই ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সহিষ্ণুতা ও সহমত ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির কালজয়ী অবদান। বটবৃক্ষের মতো তা দণ্ডায়মান, ঝড়-ঝাপটা থেকে তা নিজেকে রক্ষা করতে পারে। হিন্দুধর্ম কোনো 'ইজম' নয়, যুগ যুগ ধরে গঙ্গার স্রোতধারার মতো বয়ে চলেছে। তাই ভারতে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার উপর আঘাত হানা স্রোতের বিপরীতে যাওয়ার ভ্রান্ত প্রচেষ্টা মাত্র।

(লেখক পশ্চিমবঙ্গ স্টেট আর্কাইভস-এর অবসরপ্রাপ্ত অধিকর্তা)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

ধর্মনিরপেক্ষতা ও পঞ্চম বাহিনী

অচিন্ত্য বিশ্বাস

রাজনীতি শাস্ত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা কথাটির ব্যাপক চাষ-আবাদ চলছে। শব্দটি নিয়ে এক ধরনের বিচিত্র সংস্কার ভারতীয় রাজনীতিকে আচ্ছন্ন করেছে বলে মনে হয়। মধ্য ইউরোপ যখন ধর্মকেন্দ্র থেকে রাষ্ট্রকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছে— তখন থেকে শব্দটির ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্য পেয়েছে। চার্চ আর স্টেট ক্রমেই সমান্তরাল ব্যবস্থার দিকে সরে গেছে। কেউ কারো এলাকায় প্রবেশ করবে না এরকম মুক্ত বুদ্ধির ফলে ধর্মনিরপেক্ষতার বিকাশ ঘটেছে।

উপনিবেশিকতার মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার সংযোগ দেখিনি তেমন। উপনিবেশ প্রধানত অর্থনীতির প্রসার ও বিস্তারের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছিল। ফলে তার কামান গর্জন সর্বদা বাইবেল প্রচারের সঙ্গে মিলেমিশে থাকেনি। উত্তর উপনিবেশিক পর্বেও অর্থনীতির স্বার্থ, কূটনীতির পাশা খেলা প্রাধান্য পেয়েছে। শাসকের ধর্ম শাসিতের ধর্ম এক না হলেও মূল ব্যাপার রয়েছে বাণিজ্য বিস্তার, পণ্যসম্ভার ছড়ানো আর উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ।

> **ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় অসহিষ্ণুতা আমদানি হয়েছে মুসলমান শাসকদের সময়। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে মুসলমান শাসকরা এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মমতকে স্বীকার করেনি, সম্মান করেনি। এই ধারাবাহিকতা প্রবল হয়েছে বৃটিশ পর্বে।**

সপ্তম শতাব্দীতে আরব দুনিয়ায় ইসলাম ধর্মের উত্থান এই প্রচলিত রাজনীতি শাস্ত্রের ছকটি সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। উত্তর আফ্রিকা হয়ে মরক্কো ও স্পেন পর্যন্ত ইসলামের বিজয় ঘটেছে। দক্ষিণ এশিয়ার বিস্তৃত ভূভাগ, আফ্রিকা মহাদেশে ইসলাম ধর্মের শক্তি মদমত্ততার প্রমাণ মিলেছে। আজকের ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কিত ধ্যান ধারণা ইসলামের ধর্ম কেন্দ্রিকতা সম্পর্কে প্রায়ই নিশ্চুপ থেকে যাওয়ায় মনে হয় এই বিচার-পদ্ধতি আংশিক বা কৌশলী।

তুরস্ক একদা আরব দুনিয়া তথা ইসলামি-জাহানের নেতৃত্ব দিয়েছে। কামাল আতাতুর্ক আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ জীবন ও রাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে খিলাফত উৎখাত করে সেই ব্যবস্থার মূলে আঘাত হেনেছিলেন। মধ্যপ্রাচ্যে কামাল পাশার উদারনৈতিক ধ্যান ধারণা বিকশিত হয়নি। এর বহু কারণ আছে। প্রধান কারণ বিশ্ব অর্থনীতির আরব-দুনিয়া নির্ভরতা। প্রধান কারণ পেট্রোলিয়াম। মরুভূমির বিস্তৃত অঞ্চলে ভূগর্ভের সঞ্চিত তরল জ্বালানি এখন বিশ্ব অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। আজকের দুনিয়ায় ধর্মনিরপেক্ষ মতাদর্শ তাই অনর্থক বাক-ছল বলেই মনে হয়। সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়া যে যার স্বার্থ বুদ্ধির উপর নির্ভর করে আরব দুনিয়ার সঙ্গে পেটোলিয়াম বাণিজ্য চালাচ্ছে—তাকে নাম দিচ্ছে কূটনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বা বিশ্বশান্তি কিংবা ধর্মনিরপেক্ষ জীবনবোধ বলে।

ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার অন্য তাৎপর্য আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, শুক্রনীতি, বৃহস্পতি বা মনুর ধর্মশাস্ত্রে রাষ্ট্রধর্ম, রাজধর্ম বিভিন্ন রকম নীতি-কর্তব্য-দায়িত্ব ও বিবিধ ব্যবস্থার অন্তর্গত ছিল। অধ্যাপক অমর্ত্য সেন তাঁর বিতর্কপ্রবণ ভারত-গ্রন্থে বিষয়টির প্রতি আলো ফেলেছেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি বস্তুবাদী লোকায়ত দার্শনিকদের মতো কর্মপ্রিয়। মাতামহ আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন-কে এনিয়ে কথা বলার অবকাশে ক্ষিতিমোহন বলেছিলেন, অমর্ত্য সেনের কথাগুলি মধ্য ইউরোপীয় বোধ হলেও হতে পারে— আদতে এসবই ভারতীয় দর্শনের অন্তর্গত চার্বাকপন্থীদের প্রস্থান। ভারত চিরকালই ধর্ম অর্থ কাল মোক্ষকে চতুবর্গ বলে ধরেছে— প্রত্যেক বর্গেই বিতর্কের অবকাশ ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ। সঠিকভাবে বিচার করলে এই বিতর্কের অবকাশই আমাদের দেশকে বহুত্ববাদী, সমন্বয়শীল আর সদর্থে ধর্মনিরপেক্ষ করেছে। আজ যারা এসব নিয়ে সংসদে গরম বুলি ঝাড়ছেন, সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় অভিমতের ফুলঝুরি ওড়াচ্ছেন, দূরদর্শনের বাক্যবীর হিসাবে মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টায় চঞ্চল হচ্ছেন— তারা এই ভারতবর্ষকে দেখেছেন কিনা সন্দেহ।

উনিশ শতকে একটি তত্ত্ব জনপ্রিয় হয়। বৌদ্ধধর্ম নাকি এদেশে উদ্ভূত হলেও বেদ-ব্রাহ্মণ বিরোধী হওয়ায় সেই ধর্ম ভারতের সীমানা ত্যাগ করে প্রান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতবর্ষে বৌদ্ধদের নামগন্ধ লুপ্ত হয়ে যায়। এই তত্ত্ব যারা প্রচার করেন তারা ভেবে দেখননি

বৌদ্ধপর্বের বহু রাজা হিন্দু মন্দিরকে জমি দিয়েছেন, হিন্দু রাজারাও বৌদ্ধ বিহারের জন্য ভূমিদান পত্র দিয়েছেন। পরিবারে বৌদ্ধ সৌগতদের সঙ্গে শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণব সদস্যরা থাকতেন— এমন অজস্র প্রমাণ আছে। বৌদ্ধদের প্রধান কেন্দ্র নালন্দা সোমপুরী, পাহাড়পুর ধ্বংস করেছে মুসলমান আক্রমণকারীরা। ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার সঙ্গে ইসলাম আগমনের পূর্বে আমাদের দেশ পরিচিত ছিল না। দ্বন্দ্ব ছিল তাত্ত্বিক— যুক্তি তত্ত্ব উপস্থাপনের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় অসহিষ্ণুতা আমদানি হয়েছে মুসলমান শাসকদের সময়। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে মুসলমান শাসকরা এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মমতকে স্বীকার করেনি, সম্মান করেনি। এই ধারাবাহিকতা প্রবল হয়েছে বৃটিশ পর্বে। ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্ট দেশকে দ্বিখণ্ডিত করেছে আন্তর্জাতিক ইসলাম রাজনীতির প্রভাবে পড়া বিজাতীয় ভাবধারার রাজনৈতিক শক্তি। এরপরও ভারত রাষ্ট্র ধর্ম হিসাবে হিন্দুত্বকে সামনে আনেনি। এর কারণ হিন্দু ধর্মের চিরাচরিত ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা ও তার ফলে সৃষ্ট মানবিক মূল্যবোধ। এই মূল্যবোধ অনেকটাই নব্য ইউরোপীয় ধর্মনিরপেক্ষতার কাছাকাছি।

আজ যারা ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে বাচালতা করছেন তারা বিশ্ব ইতিহাস ও রাজনীতির এই ধারবাহিকতাকে স্বীকার করতে চান না। তারা শেষ পর্যন্ত পেট্রোলিয়াম অর্থনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কিনা এখনই বলার সময় আসেনি— তবে বর্তমান আলোচকের মনে হয় না, সেই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। উপমহাদেশের নানা প্রান্তে ভাষা-সংস্কৃতি ভিত্তিক জাতীয়তা বিকাশের ক্ষেত্রে ইসলামের আক্রমণাত্মক ভূমিকা বারবার দেখা গেছে। সম্প্রতি শাহবাগ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশে যুক্তিবাদীদের হত্যাকাণ্ডগুলি সেদিকেই নির্দেশ করে। সবদিক বিচার করলে বলতেই হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা আজ ভয়ঙ্কর চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে।

প্যারিসে জঙ্গি হামলার প্রেক্ষিতে আজ পশ্চিমি দুনিয়া বুঝতে পারছে আরব দুনিয়ায় ক্রমবর্ধমান সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রচেতনা আজ বিশ্ব শান্তি মানবতা ও সভ্যতার সামনে সব চেয়ে বড় বিপদ। ভারতীয় উপমহাদেশে এই অভিমতের পক্ষে জনজোয়ার গড়ে ওঠার কথা। এর মাঝখানে আশ্চর্য হলেও দেখা যাচ্ছে পঞ্চমবাহিনীদের ভয়ঙ্কর ছক। তারা কখনো বলছে ভারত নাকি অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে, কখনো বলছে ভারতে পরের প্রজন্মকে নিয়ে বাস করাই নাকি সম্ভব নয়। আর চলছে ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে স্কুল-কলেজ স্তরের মেঠো বক্তৃতা। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা কোনোক্রমেই ইসলাম-তোষণের মাধ্যমে বিকশিত হবার নয়। প্যারিস হামলার পরে মার্কিন রাষ্ট্রপতি সেকথা খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন। আর আমাদের দেশে গোমাংস খেয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার জয়ঢাক যারা বাজাচ্ছেন তাদের পঞ্চমবাহিনী বলে চিহ্নিত করতে আর দেরি করা উচিত হবে না। মেটিয়াবুরুজ-গার্ডেনরিচ আর খাগড়াগড়— দৃষ্টান্তগুলি সাজিয়ে ধরলে তেমনি মনে হয়।

(লেখক গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য)

১৯৪৮ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

প্রতি সংখ্যা ১০ টাকা

স্বস্তিকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০টাকা

অবহিত হবার এবং অবগত করার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম

—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—

২৭/১বি, বিধান সরণি, কোলকাতা-৭০০০০৬

দূরভাষ (০৩৩) ২২৪১০৬০৩, ২২৪১৫৯১৫

চিঠিপত্র

বাংলার রুদালীরা

দাদরি কাণ্ডে জাতীয় পুরস্কার ফিরিয়ে দেওয়ার হিড়িকে বাংলাকে নির্বিকার দেখে রাজ্যের কিছু সাংবাদিক ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এই বিষয়ে কিছু বলার আগে বাংলার প্রথিতযশা সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের অনুরোধ করি আসুন, সবাই মিলে একবার পিছন ফিরে হাঁটি ১৯৯০ সালের ৩০ মে-র দিনটিতে। পৈশাচিক উল্লাসে সিপিএমের হার্মাদ বাহিনী সেদিন অনিতা দেওয়ানের গোপন অঙ্গে দুই ব্যাটারির টর্চ প্রবেশ করিয়ে তার অকালমৃত্যু ঘটিয়েছিল। 'বর্তমান' এর বরুণ সেনগুপ্ত ও সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত ছাড়া (বিশদ বিবরণ, ৩৬৫ দিন, ৩০.৫.১৩) আর সব কবি, সাংবাদিক ও বিদ্বজনেরা 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' জপ করে দাঁড়িয়ে থেকেছিল নিরাপদ দূরত্বে। ইতিহাসের পাতা উল্টে তাই দেখতে চাইছি আজকের এই বহুচর্চিত, বহু উল্লিখিত সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের উৎসস্থল কোথায়? বৈদ্যুতিন ও মুদ্রিত মাধ্যমের কল্যাণে তো আজ বুদ্ধিজীবীরা পিছিয়ে। এগিয়ে রয়েছে কিছু নাট্যকার, নাট্য নির্দেশক, চিত্রশিল্পী, কণ্ঠশিল্পী বা শিল্পী যশোপ্রার্থীদের বিদগ্ধ মুখমণ্ডল যারা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বেশি পরিচিত হয়ে উঠেছে। অবশ্য বুদ্ধিজীবীদেরও অগ্রগণ্য দাবিদারেরা আমজনতার কথা বলেন কলকাতায় বসে ও উপগ্রহপুঞ্জের মতো বিরাজমান যশোপ্রার্থীদের দল পরিবৃত হয়ে। দেশরক্ষায় প্রতিদিন আমাদের জওয়ানেরা মারা যাচ্ছে। তাদের ওপারে নিয়ে গিয়ে জীবন্ত অবস্থায় পুরুষাঙ্গ কেটে নেওয়া হচ্ছে--- এই সব দেখেও আমাদের বুদ্ধিজীবীদের মুখে অমলিন হাসি। গজলগায়ক আলি অবশ্যই সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী, কিন্তু তাঁরও তো একটা মানবিক মুখ আছে। প্রতিনিয়ত ভারতের বুকে লুণ্ঠন, অত্যাচার ও সন্ত্রাসসৃষ্টিকারী জঙ্গীদের বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠে এই ভারতের ত্রিবেণী তীর্থ পথে একটা গান শুনতে চাওয়া কি অপরাধ? প্রাক্তন পাক বিদেশমন্ত্রী কাসুরির হাস্যকর সাফাই 'আমি তো তখন বিদেশমন্ত্রী ছিলাম না' শুনেও আমাদের বুদ্ধিজীবীরা হাসতে ভুলে গেছে।

দাদরি কাণ্ডে একজন নিহত হওয়ার ঘটনা অবশ্যই দুঃখজনক। কিন্তু গোধরায় ৫২ জন করসেবককে পেট্রল ঢেলে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার প্রতিক্রিয়ায় গুজরাটের দাঙ্গা নিয়ে কাঁসরঘণ্টা আজও বেজে চলেছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো যাদের বিরুদ্ধে এই কাঁসরঘণ্টা, গুজরাটের জনগণ ভোট দিয়ে তাদেরকেই ক্ষমতায় বসিয়েছে গত তিন দশকের উপর। কেন? সেই সত্য উদঘাটন করলে যেটি বেরিয়ে আসবে সেটি বুদ্ধিজীবীদের মনঃপুত হবে না বলেই এত চীৎকার, এত বিষোদগার। একদিকে এই বিষোদগার, অন্যদিকে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ, সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদারদের 'ফিরে নাহি দিব, পুরস্কার' বলে জনসাধারণকে গবেট ভেবে হাস্যকর যুক্তির অবতারণায় সাংবাদিক সুমনবাবুর কণ্ঠে বিলাপের করুণ রাগিনী। আশ্চর্যের বিষয় হলো আমাদের দেশে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পাওয়া অমর্ত্য সেন বা যাঁর কাজের বিশেষ মূল্যায়নকারী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, এন রাম, সুধীর আনন্দ, এ কে শিবকুমার (দ্রষ্টব্য সম্পাদক সমীপেষু, আনন্দ বাজার পত্রিকা ১০.৯.১৩) প্রভৃতিকে পেয়েও ভারতের উপযোগী কোনো অর্থনৈতিক মডেল দিতে না পারলেও সুমনবাবুদের কণ্ঠে কোনো করুণ রাগিনী বেজে উঠতে শোনা যায় না।

সে যাই হোক এক বাংলা দৈনিকে পড়লাম আমাদের রাষ্ট্রপতি মাননীয় প্রণব কুমার মুখার্জি বলেছেন, ভারতীয় সভ্যতার মূল ভিত্তি হলো 'বহুত্ববাদ'। তা না হলে ভারতীয় সভ্যতা ৫০০ বছরও টিকে থাকত না। এটি প্রতিষ্ঠা করতে তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে ভারতে ১০০টি ভাষা, ১০৬টি উপভাষা ও ৬০টির বেশি ধর্ম আছে। এইসব হয়তো ঠিক কিন্তু ভারতের একজন নাগরিক হিসাবে বাস্তবে যা চলে আসছে সেই সব কথা কিছু বলি। প্রথমে বলি ভাষার কথা। বাংলা ও কেরলের মানুষজন কেউ কারও ভাষা বোঝে না, পোশাক পরিচ্ছদ ও খাদ্যাভ্যাসও আলাদা। কিন্তু এই সেদিন বিশ্বের বৃহত্তম জনসমাবেশ নাসিকের কুম্ভমেলায় এক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ভারতবাসী প্রমাণ করলো বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। আর এটি চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। আর ধর্ম? ১৮৯৩ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর উত্তর আমেরিকার চিকাগো শহরের আর্ট ইনস্টিটিউটের কলম্বাস হলে ৭ হাজার শ্রোতার শাসনে মাত্র ৩ মিনিট ৩৯ সেকেন্ডের কালজয়ী ভাষণে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, হে প্রভো, বিভিন্ন পথে গিয়াও যেরূপ সকল নদী একই সমুদ্রে পতিত হয়, ভিন্ন ভিন্ন রুচিহেতু সরল ও কুটিল প্রভৃতি নানা পথগামীদেরও তুমিই সেইরূপ একমাত্র গম্যস্থান। ভারতের এই চিন্তা, ধর্ম ও দর্শনকে বিশ্বমাঝে নিয়ে আসা বিবেকানন্দকে আমরা বুঝিনি, চর্চা করিনি। বেদ চাষার গান আর চাকুরী না পেয়ে বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী হয়েছিলেন বলে যে অট্টহাস্য চলছিল তার অবসান হোত না যদি রাশিয়ার অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর কোস্তুচেনকভ বিবেকানন্দ সম্পর্কে একটি বই না লিখতেন। তাঁর বইটি ১৯৭৭ সালে রাশিয়ান সরকারের স্বীকৃতি লাভ করে এবং তখন থেকে বিবেকানন্দ রাশিয়ায় মান্যতা লাভ করেন। আর ভারতের কম্যুনিস্টরা? তাদের রাশিয়ান অভিভাবকদের কথা শুনে তাঁর মৃত্যুর সময়ও নয়, তাঁর মৃত্যুর ৭৫ বছর পর তাঁকে স্বীকৃতি দিতে শুরু করে।

সুভাষ চন্দ্র বসু দেশপ্রেমিক ছিলেন কি না সেটা বুঝতে ভারতের কমিউনিস্টদের বহু বছর সময় লাগার কথা বাদ দিলেও তাঁর সম্পর্কে আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু কি বলেছিলেন শুনুন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজী যখন বিদেশে যুদ্ধরত নেহরু তখন ১৯৪২ সালে বলেছিলেন, 'সুভাষ যদি ভারতের মাটিতে পা দেয়, আমি তাকে তরবারি দিয়ে প্রতিরোধ করব'। (প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা মোহিত

সেন, নিউওয়েভ, নভেম্বর ১৫, ১৯৮৭) এই নেহরুই নেতাজীর তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার কয়েকদিন বাদে ইংলন্ডের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলিকে চিঠি লিখেছিলেন, যুদ্ধাপরাধী ঘোষণা করে সুভাষ বোসকে কেন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছে না? (ভগবতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বর্তমান' ২.৮.১৫) স্বাধীনতার ৬৮ বছর পেরিয়ে এসেও দেখা যাচ্ছে শুধুই ক্ষমতার লালসা, ত্যাগ বা কষ্ট স্বীকারের কোনো ইচ্ছা নেই, দেশভক্তির কোনো চিহ্ন তো নেইই। বিবেকানন্দ নিয়ে কোনো চর্চা নেই, বছরে একদিন দায়সারাভাবে নেতাজীর জন্মদিন পালন ও তারপর ভুলে যাওয়া, 'জনগনমন অধিনায়ক জয় হে' গানটি সম্রাট পঞ্চম জর্জের আগমন উপলক্ষে রচিত বলে রবীন্দ্রনাথকে অপমান করে কি নতুন ভারত গড়া যাবে? আমাদের জানতে হবে অনেক কিছু। জানতে হবে পৃথিবীর কোন্ দেশ বহুত্ববাদের উপর তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছে। জানতে হবে— মায়া সভ্যতা, মিশরীয় সভ্যতা, রোমান সভ্যতা, গ্রীক সভ্যতা, ব্যবিলনীয় সভ্যতা যখন উৎপাটিত ও মৃত হয়ে ফসিলে পরিণত হয়েছে তখন মাত্র ৫০০ বছর নয় খৃ.পূ. ৩০০ অব্দ থেকে ১৯৪৭ সালের পরেও ২২ শত বছর বিদেশী ধর্ম ও রাজশক্তিকে প্রতিহত করে কোন প্রাণশক্তিবলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বেঁচে রইল? বিষয়টি কি গভীর চিন্তা ও গবেষণার বিষয় নয়? ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সেই অতীত ধারা যুগানুকুল হয়ে আজও প্রবহমান। ভারতজননীকে যারা 'মা' বলে ডাকতে কুণ্ঠাবোধ করে, পশ্চিমের মাটিই যাদের কাছে অতি পবিত্র, প্রতিবার নিঃশ্বাস ফেলার আগে যাদের একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে অনুমতি নিতে হয়, তারা ভারতে অরণ্যের দিনরাত্রির অবসানের অভ্যুদয় দেখে শঙ্কিত। দুই জার্মানীর বিভেদ করা প্রাচীরটিকে যেমন গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এখানেও তেমনি ভাষা ও ধর্মের ভিত্তিতে নির্মিত বহুত্ববাদের প্রাচীরটি ভেঙে 'একটিই ভারত' নির্মাণের প্রচেষ্টা দেখে তারা কাঁদবার লোক খুঁজছে। পেয়েও গেছে কিছু পেড নিউজ করা ও হলুদ সাংবাদিককুল এবং স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবীদের। আমরা এই রুদালীদেরই ক্রন্দন শুনতে পাচ্ছি বাংলার আকাশে বাতাসে।

—**অমল কান্তি বসু,**
বাগনান, হাওড়া।

ইসলামীয় জঙ্গি হামলা ও তার প্রতিকার

পৃথিবীব্যাপী ক্রমবর্ধমান ভয়ঙ্কর জঙ্গি হামলায় উন্নত ও উন্নতিশীল দেশগুলি বিপর্যস্ত। এই হামলার আগাম সঙ্কেত পাওয়া, হামলা প্রতিরোধ ও বিবিধ সতর্কতা গ্রহণ ইত্যাদির জন্য এই সমস্ত দেশগুলিকে প্রচুর শ্রম ও অর্থ খরচ করতে হচ্ছে। তবুও এই হামলা এবং লোক ও সম্পত্তি ক্ষয় ক্রমবর্ধমান। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই, যুগোশ্লাভিয়া যখন মুসলিম চেচেনিয়া জঙ্গি আক্রমণে বিপর্যস্ত, তখন তারা ঘোষণা করলো যে কোনো জঙ্গি জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরা হবে তাদেরকে শুকর মাংস, হাড়, চামড়া-সহ কবরস্থ করা হবে। তারা এইরূপ করতেও শুরু করল এবং ধীরে ধীরে জঙ্গি আক্রমণ বন্ধ হয়ে গেল।

আধুনিক মুসলমান পণ্ডিতদের মত ইসলাম জঙ্গিবাদ সমর্থন করে না। অন্যদিকে ইসলামি বিশ্বাস শুকর মাংস, হাড় বা চামড়া সহ কবরস্থ করলে বেহেস্তের গতি রুদ্ধ হয়ে যায়। ইসলামের বিকৃত মতবাদে বিশ্বাসী স্বর্গসুখ ভোগের আশাবাদী জঙ্গিরা তাই বেহেস্তের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবার ভয়ে ধীরে ধীরে জঙ্গিপনা ছেড়ে দেয়।

তাই আমার মতে স্লিপার সেলের মাধ্যমে জঙ্গিপনা করার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এই প্রচণ্ড হিংস্র বর্বর জঙ্গিদের আটকানোর জন্য সারা পৃথিবীব্যাপী এই নীতিই গ্রহণ করা উচিত। কারণ, এতে ইসলামের বিরোধিতা হয় না। এটাই অনেক বেশি কার্যকরী সহজ পথ হবে বলে মনে হয়।

—**অমরনাথ দে,**
কলকাতা-৭০০০০৯।

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

গত ১ জুন ২০১৫ সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকায় অর্ণব নাগের আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহৎ জীবন বৃহৎ কর্ম প্রচ্ছদ নিবন্ধে লিখেছেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের জন্ম হুগলি জেলার হরিপালে।

আমি তারকেশ্বর থানার অন্তর্গত শ্যামপুরের বাসিন্দা। এই শ্যামপুর গ্রামের প্রয়াত জানকীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন ১৩৮৪ সালের খাতা থেকে ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা যায়, যে ব্রজেন্দ্রনাথের জন্মস্থান অনুসন্ধান ও তার স্মৃতি রক্ষার সম্পর্কে প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন রাঢ়ীয় অনুসন্ধান সমিতি এবং হুগলী জেলার গ্রন্থাগার সমিতি তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সম্পাদক ফণিন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়।

তিনি এই শ্যামপুর গ্রামকেই ব্রজেন্দ্রনাথের জন্মস্থান বলে গণ্য করেছিলেন। এ ছাড়াও শীল বংশের সেবা-পূজার জন্য সেবাইতগণকে অর্পিত দান পত্র থেকে এবং গ্রামের প্রাচীন ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনার পর এই শ্যামপুর গ্রামকেই ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের জন্মস্থান— এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার তথ্য পাওয়া যায় খাতাটিতে।

ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের স্মৃতিরক্ষাকল্পে বিদ্যালয়, গ্রন্থগার, স্থাপন, মূর্তি বা স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা হওয়ার কথা ছিল। নানা কারণে কমিটি তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি, যা অনুসন্ধানের বিষয়। তা ছাড়াও এই গ্রামের শীল বংশের বাস্তুভিটা ও ভগ্নপ্রায় জোড়া মন্দির এবং ২টি শীল পুকুর আছে এই গ্রামে।

শ্যামপুরের লাগোয়া জয়নগর গ্রামে ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের জন্মস্থান এই বিতর্ক দীর্ঘদিন চলে আসছে। এই বিতর্কের নিষ্পত্তির প্রয়োজন।

—**তমাল ব্যানার্জী,**
শ্যামপুর, তারকেশ্বর, হুগলী।

কালিকা পুরাণের ইতিবৃত্ত

রবীন সেনগুপ্ত

হিন্দুদের পুরাণের সংখ্যা একশোর কিছু বেশি। তার মধ্যে আঠারোটি মহাপুরাণ ও আরো আঠারোটি হলো উপপুরাণ। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বিরচিত কালিকা পুরাণটিকে বেশিরভাগ পণ্ডিতই মহাপুরাণের তালিকায় রাখেননি। কিন্তু উপপুরাণের তালিকায় কালিকা পুরাণের নাম পাওয়া যায়। উপপুরাণ হলেও তথ্য ও তত্ত্বের দিক নিয়ে কালিকা পুরাণ অন্য কোনো পুরাণের চাইতে কোনো অংশে কম নয়।

পৃথিবী যে নিজ অক্ষের উপর ঈষৎ হেলে অবস্থান করছে সে কথা কালিকা পুরাণেই প্রথম ঘোষণা করা হয়। এই পুরাণে ২৫তম অধ্যায়ের ৩৭ তম শ্লোকে বলা হয়েছে— 'শূন্যা দিগ্বায়রী তত্র ততো নম্রা স্থিতা ক্ষিতিঃ।'

রামচন্দ্র যে ত্রেতাযুগে জন্মেছিলেন সেকথা নানা শাস্ত্রে লেখা থাকলেও তিনি ত্রেতার কোন সময়ে জন্মেছিলেন তা খুব কম শাস্ত্রেই লেখা আছে। এই বিষয়ে কালিকা পুরাণের ৩৬ অধ্যায়ে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা আছে যে রামচন্দ্র ত্রেতার মধ্যভাগে জন্মেছিলেন।

সেই যুগের চল্লিশ প্রকার গহনার নাম আমরা কালিকা পুরাণ থেকেই পাই। এই সকল গহনার কয়েকটি নাম হলো— ললাটিকা, গ্রৈবেয়ক, উর্ম্মিকা, অক্ষমালিকা, বাহুবলয়, অঙ্গদ, শিখাভূষণ, নাভিপুর, হংসক, পাদাঙ্গদ, দন্তপত্র, কর্ণক, উরুসূত ইত্যাদি। এই নামগুলি ৬৯তম অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম হলো জনার্দ্দন। কালিকা পুরাণের ৫৮ অধ্যায়ে বলা আছে যে— দুষ্ট জনগণের আর্দন বা পীড়ন করার জন্যই কৃষ্ণের অপর নাম জনার্দন। আর জনগণের নানাবিধ কামনাকে পূর্ণ করেন বলেই কালীমায়ের অপর নাম কামাখ্যা।

যদি কোনো দুরাচারী ব্যক্তিকে হত্যা করলে বহু মানুষের উপকার করা হয় সেক্ষেত্রে হত্যাকারীর কোনো পাপ হয় না— এই তত্ত্ব পুরাণের বিংশ অধ্যায়ে রয়েছে। রাজনীতি সম্পর্কে নানা তথ্য কালিকা পুরাণে রয়েছে। প্রশাসনিক প্রধানদের সঙ্গে খোলাখুলি মিশতে নেই, সম্ভ্রমজনক দূরত্ব বজায় রাখতে হয়, ক্ষমতার লোভে লালায়িত আত্মীয়দের সম্পর্কে সাবধানে থাকতে হবে, কেউ প্রশাসনকে ছাপিয়ে উপরে উঠতে চাইছে দেখলে— তাকে যে করে হোক টেনে নিচে নামিয়ে দিতে হবে— এইসব রাজনৈতিক কূটকৌশলের নির্দেশ এই পুরাণের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে।

দেবী পূজার নানাবিধি, নানা উপাচার, দেবীর নানা মহিমা যে এই পুরাণে থাকবে— সেটা তো স্বাভাবিক। কিন্তু এর বাইরেও এত তথ্য ও তত্ত্ব কালিকা পুরাণে রয়েছে যে তা ভক্ত ও গবেষকদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান রূপেই প্রতিভাত হয়ে থাকে।

কোটিপতি হোন!
নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন
মিউচুয়াল ফাণ্ডে SIP করুন
১০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৩ পর্যন্ত SIP-তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের ফান্ড ভ্যালু বর্তমানে ৩২ লাখ টাকা।
যোগাযোগ ঃ দেবাশিষ দীর্ঘাঙ্গী, শুভাশিষ দীর্ঘাঙ্গী
DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
9830372090
9433359382
মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

মন্ত্রমালা

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শতনাম

সুনীল কুমার দাস

ধর্মপ্রাণ হিন্দু ভক্তজনচিত্তে 'নাম'-এর গুরুত্ব অপরিসীম। অথচ পরিতাপের বিষয় শ্রীশ্রীকৃষ্ণের 'অষ্টোত্তর শতনাম' ছাড়া বিগত পাঁচশতাধিক বৎসর-কালের মধ্যে আমাদের এই বঙ্গ-সমাজে এ সম্পর্কে দ্বিতীয় আর কোনো ভাবনা-চিন্তা পরিলক্ষিত হয়নি। ধর্মের ওই নিগূঢ় বিষয়টি সম্পর্কে বাঙালি বিদ্বজ্জনদের কিছুটা উন্নাসিক মনোভাবই হয়তো এর কারণ।

শ্রীভগবানের প্রতিটি নামই দিব্য, অলৌকিক, অপৌরুষেয়। নামের স্মরণ-মনন ও কীর্তনের দ্বারা জীবের সর্ববিধ মঙ্গল সাধিত হয়। কেবল নামকে আশ্রয় করলেই সাধকের শ্রেয়োলাভ বিষয়ে আর কোনো সংশয় থাকে না। শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতায় শ্রীভগবান নিজেই তাঁর 'নাম' জপকে সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ বলে অভিহিত করেছেন। নামই সাধন তত্ত্ব। নামই মন্ত্র। নামই পরম পুরুষার্থ। এই নামই এখানে নব কলেবরে মন্ত্রমালা রূপে প্রকাশিত। খুব সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠতে পারে আমাদের এই বঙ্গসমাজে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বহুল প্রচলিত 'অষ্টোত্তর শতনাম' থাকা সত্ত্বেও কেন আবার নূতন করে এই মন্ত্রমালার পরিকল্পনা? তবে কি এটি কেবল পাণ্ডিত্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে তাঁর নাম-স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য? নাকি প্রচলিত ধারার পরিবর্তে নূতন, পরিপূরক অথবা অন্য কোনোভাবে নাম-পিপাসু ভক্তগণের বাড়তি কোনো চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে বলে? বিষয়গুলি যথাযথ ভাবে বিচার না করে তা গ্রহণ অথবা বর্জন করাটা মোটেই বিজ্ঞজনোচিত কাজ নয়।

প্রথমত, মন্ত্রমালার প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে একাধিক নামের সাশ্রয় আছে বলে কর্মব্যস্ত মানুষ তুলনামূলক কম সময়ের মধ্যে অধিক নাম গ্রহণে সক্ষম হবেন।

দ্বিতীয়ত, ছন্দ-মাধুর্যের ক্ষেত্রে মন্ত্রমালা কিছুটা ব্যতিক্রমী। কারণ কেবল নামকেই ছন্দের মূল বিষয় করে নামপিপাসু ভক্তগণকে এখানে নাম গ্রহণের বাড়তি সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। তবে সংগীতপিপাসু ভক্তগণ খোল করতাল সহযোগে সুরতালের নানান নিজস্ব আঙ্গিকেও এটি গাইতে পারেন।

তৃতীয়ত, নাম চয়নের ক্ষেত্রেও মন্ত্রমালা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী, কারণ গীতা, ভাগবত, শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, বিষ্ণু-পুরাণ ইত্যাদি আকর গ্রন্থ সমূহের মধ্যস্থিত বহুল প্রচলিত এবং সাধারণভাবে অধিক ব্যবহৃত নাম-সমূহেরই এটি একটি দুর্লভ মন্ত্র সংকলন।

চতুর্থত, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বিষ্ণুর নানান প্রণাম ও ধ্যানমন্ত্রের অনেক নামও এই মন্ত্রমালায় যুক্ত হয়েছে। যুক্ত হয়েছে প্রাতঃস্মরণীয় দশাবতার স্তোত্রের প্রায় প্রতিটি নাম। এছাড়াও এখানে যুক্ত হয়েছে প্রচলিত অষ্টোত্তর শতনামের বহু নাম। এইভাবে বিচার করলে মননশীল নাম-পিপাসু ভক্তজন-চিত্তে মন্ত্রমালার মন্ত্রগুলিই যে আকর্ষণের মূল বিষয় হয়ে উঠবে তাতে আর আশ্চর্য কি!

পঞ্চমত, নাম গ্রহণের জন্য শ্রীভগবানের কৃপা প্রার্থনা ও অতি সংক্ষিপ্ত 'নাম-মাহাত্ম্য' যুক্ত করে মন্ত্রমালাকে সর্বতোভাবে ভক্তজনোপযোগী করার প্রচেষ্টা হয়েছে। আমি অনধিকারী। তবে তাঁর কৃপা হলে পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করে। নাম-পিপাসু ভক্তগণ যদি মন্ত্রমালায় ডুব দিয়ে দুর্লভ নামতত্ত্ব লাভের বাড়তি কোনো প্রেরণা পান তাহলে তা শ্রীভগবানেরই অসীম কৃপা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কি নামে তোমাকে ডাকি ওগো দয়াময়।
কি নামে তোমাতে ভক্ত প্রেমাসক্ত হয়।।
কোন নামে ধরা দাও ভক্তের হৃদয়ে।
কোন নামে থাকে ভক্ত প্রেমাবিষ্ট হয়ে।।

ত্রয়-তাপ দূর হয় কোন নাম গুণে।
দূর হয় ভব-ভয় কি নাম শ্রবণে।।
কি নামে অজ্ঞান-মোহ পাপ বিমোচন।
কি নামে সফল হয় মানব জীবন।।
কি নামে জীবের মুক্তি কর্ম-বন্ধনাশ।
কি নাম কীর্তনে হয় পূর্ণ অভিলাষ।।
তুমি তো দীনের বন্ধু, অগতির গতি।
দিব্য সেই নাম-মন্ত্রে দাও শুভ-মতি।।
নামেই রয়েছো তুমি শ্রীহরি, কানাই।
জ্ঞান-ভক্তি পরা-শক্তি নাম ছাড়া নাই।।
কৃপা করে দাও প্রভু নামের শরণ।
নামেতেই সদা যুক্ত থাকে যেন মন।।
তুমিই গোবিন্দ, গুরু, অভয় শরণ।
পরম দয়াল হরি, কমল-লোচন।।
জগৎ-বিধাতা তুমি মুকুন্দ, মুরারি।
ত্রি-ভঙ্গ, বঙ্কচন্দ্র, নিকুঞ্জ-বিহারী।।
তুমি সর্ববেত্তা, প্রভু, দেব জগন্নাথ।
দীনবন্ধু, কৃপাসিন্ধু, অনাথের নাথ।।
দামোদর, গদাধর, তুমি সর্বেশ্বর।
রাধা-মাধব তুমি মুনি-মনোহর।।
কৃষ্ণ, কেশব তুমি কেশিনি-সূদন।
সর্বলোক-পিতা তুমি দেব নারায়ণ।।
তুমি ত্রি-লোকস্বামী, বিপদ-ভঞ্জন।
নৃসিংহ, বরাহাচ্যুত, শ্রীমধুসূদন।।
রসিক-নাগর তুমি রাস-রাসেশ্বর।
গোপীজন-মনোহর, শ্রীপতি, শ্রীধর।।
রসময়, রসসিন্ধু, নট-নারায়ণ।
দারিদ্র-ভঞ্জন তুমি নন্দের নন্দন।।
পার্থসারথী তুমি, কমলার পতি।
ননী-চোরা, কালাচাঁদ,
যদুকুলপতি।।
পুরাণ-পুরুষ তুমি পুরুষোত্তম।
ত্রি-বিক্রম, ক্ষীরোদশায়ী, দিব্য
শুভাঙ্গম।।
অনাদি, অনন্ত তুমি জ্ঞানাতীত
প্রভু।
দয়ানিধি, চিন্তামণি, জ্যোতির্ময়
বিভু।।
তুমি সর্ব-যজ্ঞেশ্বর, যশোদা নন্দন।
বনমালী, গোপ-কৃষ্ণ,
লক্ষ্মী-নারায়ণ।।
তুমি হয়গ্রীব, বিষ্ণু, রাম, বলরাম।
ত্রি-মূর্তি, ভুজগশায়ী, দূর্বাদলশ্যাম।।
তুমি মহালয়কারী, দেব মহাকাল।
অনুপম বংশীধারী, ব্রজের রাখাল।।
তুমি ধৃত-শঙ্খচক্র, নীলপীতবাস।
পদ্মাহস্ত, গদাপাণি, কর্মবন্ধনাশ।।
অচিন্ত্য, অচ্যুত, তুমি ব্রহ্ম, সনাতন।
মৎস্য, কূর্ম, তুমি বরাহ, বামন।।
তুমি পূর্ণ অভিলাষ, অভীষ্ট পূরণ।
বাসুদেব, হৃষীকেশ, অজ্ঞান-নাশন।।
তুমি দেব জনার্দন, মিত্র হিতকারী।
ভব-ভয়হারী তুমি গোবর্ধন-ধারী।।

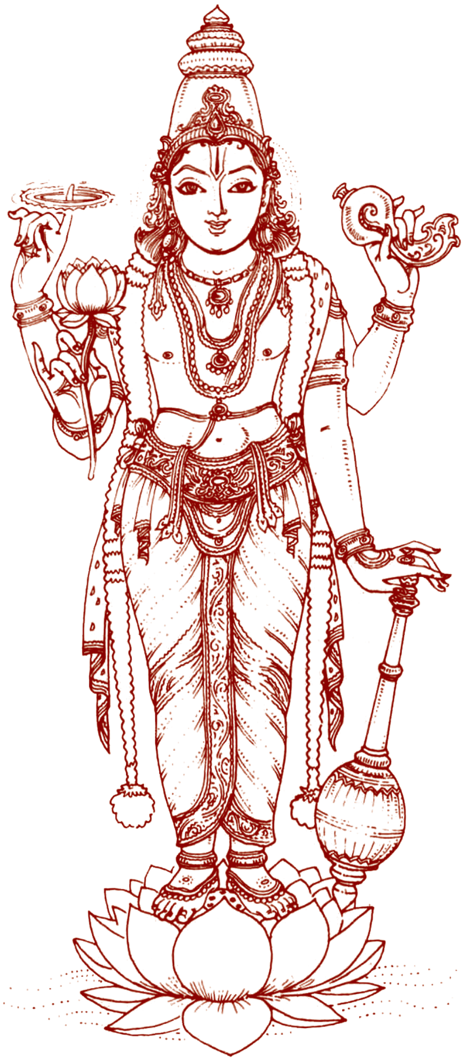

তুমি যোগেশ্বর, কৃষ্ণ, অখিল-বান্ধব।
সংসারের সারতত্ত্ব দেব শ্রীমাধব।।
নিত্য এই মন্ত্রমালা যে করে পঠন।
লাভ হয় পরাশান্তি শাস্ত্রের বচন।।
পাপ তাপ মুছে যায় এই নাম গুণে।
শুদ্ধচিত্ত ভক্তগণ এই তত্ত্ব জানে।।
ভক্তিলাভে মুক্তিলাভে থাকে না সংশয়।
নামের আশ্রয়ে ভক্ত থাকেন নির্ভয়।।
নামগুণে সর্বসিদ্ধি কৃষ্ণলাভ হয়।
গুরু শাস্ত্র বেদ বাক্য কভু মিথ্যা নয়।।
দুর্লভ এ নামতত্ত্ব অমূল্য রতন।
বহুভাগ্যে নামে মজে সুধী ভক্তগণ।।

(লেখক রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক)

ইতিহাসের গল্প

নবাঙ্কুর

চাণক্যের বোধোদয়

চন্দ্রগুপ্তের গুরু চাণক্য। তাঁদের দুজনের মনেই সংকল্প, অত্যাচারী রাজা ধননন্দকে সিংহাসন চ্যুত করে ভারতে এক সুশাসনের প্রতিষ্ঠা করা। সেইমত চাণক্যের পরামর্শে চন্দ্রগুপ্ত সৈন্য জোগাড় করতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যেই গড়ে উঠল এক বিশাল সেনাবাহিনী। সেই বাহিনী নিয়ে চন্দ্রগুপ্ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। কেবল গুরুদেবের আদেশের অপেক্ষা।

তারপর চাণক্য একদিন চন্দ্রগুপ্তকে ডেকে ধননন্দকে আক্রমণের আদেশ দিলেন। গুরুর আদেশ পেয়ে চন্দ্রগুপ্ত আর দেরী করল না, সঙ্গে সঙ্গেই বেড়িয়ে পড়লো যুদ্ধের জন্য। বয়স কম তাই পরামর্শদাতা হিসেবে চাণক্যও তাঁর সঙ্গে গেলেন। চাণক্যের পরিকল্পনা ছিল— সরাসরি রাজধানী আক্রমণ করে তারা ধননন্দকে পরাজিত করে বন্দী করবে। যেমন পরিকল্পনা তেমন কাজ। চন্দ্রগুপ্ত তার বিশাল বাহিনী নিয়ে এগোতে থাকলো ধননন্দের রাজধানীর দিকে।

এদিকে গুপ্তচর মারফত এই খবর এসে পৌঁছাল ধননন্দের কাছে। ধননন্দও যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে লাগল। কিন্তু তাঁর আগেই হঠাৎ একদিন সকালবেলা তার রাজধানী আক্রমণ করল চন্দ্রগুপ্ত। দু-পক্ষের মধ্যে শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ। সারাদিন ধরে যুদ্ধ চলতে থাকল। কারো ক্ষমতা কম নয়, তাই কেউ হার মানে না। যেহেতু রাজধানী তাই ধননন্দেরও ছিল বিশাল সেনাবাহিনী। সবাই প্রাণপণে যুদ্ধ করতে লাগল। অবশেষে ধননন্দের কাছে হার মানতে হলো চন্দ্রগুপ্তকে। বন্দী হলো তাঁর সেনাবাহিনী। চাণক্য তখন রাতের অন্ধকারে চন্দ্রগুপ্তকে নিয়ে আত্মগোপন করলেন।

কিন্তু একবার পরাজয় হয়েছে তো কি হয়েছে? আশা ছাড়ার পাত্র নন চাণক্য। ছদ্মবেশে দুজনে ঘুরতে লাগলেন দেশে বিদেশে। চেষ্টা করতে লাগলেন নতুন সেনাবাহিনী গঠনের। সেই উদ্দেশ্যেই তারা একদিন এক গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন। বর্ষাকাল, অঝোড় ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যে নেমে এলো অথচ বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণ নেই। চাণক্য খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন, এদিকে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর চন্দ্রগুপ্ত। তখন বাধ্য হয়ে তাঁরা আশ্রয় নিলেন এক গৃহস্থের বাড়িতে।

অতিথি হলেন নারায়ণ তুল্য, তাই গৃহস্বামী তাদেরকে আপ্যায়ন করে ঘরে বসালেন। চাণক্য খুব প্রসন্ন হলেন। বাড়ির গৃহবধূ ব্যস্ত হয়ে পড়ল অতিথির সেবা করার জন্য। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাক পড়ল রাতের ভোজন করার জন্য। চন্দ্রগুপ্তের ক্ষিদেটা যেন হঠাৎ বেড়ে গেল। গৃহস্বামী তাদেরকে নিয়ে পঙক্তি ভোজনে বসলেন। সঙ্গে চার বছরের শিশুপুত্র। গৃহবধূ ধোঁয়া ওঠা গরম খিচুরি ঢেলে দিল তাদের পাতে। গন্ধে চারিদিক ভরে উঠল। চন্দ্রগুপ্তর মনে হলো—আঃ, কতদিন খাইনি। পেট ভরে খেতে লাগল সে। আর এদিকে এক কাণ্ড ঘটিয়ে বসল বাড়ির সেই শিশুটি। পাতে খিচুড়ি পড়া মাত্রই সে থালার মাঝে থাবা বসিয়ে দিল। গরম খিচুড়িতে তার নরম হাতে ফোঁসকা পড়ে গেল। মা তখন তাকে কোলে বসিয়ে আদর করতে করতে বলল— সোনা, তুই তো চাণক্যের মতো কাজ করলি।

এই কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন চাণক্য। কিছুক্ষণের জন্য বাকরুদ্ধ হয়ে গেল তাঁর। কি বলতে চাইছে এই গৃহবধূ? প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন চাণক্যের বেশি সময় লাগলো না এর অর্থ বুঝতে। ধননন্দের রাজধানী অর্থাৎ রাজ্যের মধ্যাংশ আক্রমণ করে তারা চরম ভুল করেছে। কারণ রাজধানীই হলো কোনো রাজ্যের সবচেয়ে সুরক্ষিত স্থান। তাই রাজধানী দখল করতে হলে আগে কম সুরক্ষিত সীমান্তগুলি দখল করতে হবে। যেভাবে আমরা খিচুড়ির ঠাণ্ডা অংশগুলো আগে ভক্ষণ করি।

পরবর্তীতে এই নীতি অনুসরণ করেই চন্দ্রগুপ্ত ধননন্দকে পরাজিত করে এবং ভারতবর্ষে এক আদর্শ ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়।

বিরাজ নারায়ণ রায়

রাজ্য পরিচিতি

গোয়া

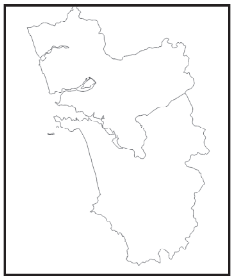

পশ্চিম ভারতের ক্ষুদ্র একটি রাজ্য গোয়া। নীল সমুদ্রসীমা তার একদিক বেষ্টন করে রয়েছে। আর বিশ্বের অপার সৌন্দর্য যেন সেখানেই এসে ধরা দিয়েছে। গোয়ার সমুদ্র উপকূলের এই আকর্ষণের জন্য দেশ বিদেশের বহু পর্যটক সারাবছর এখানে এসে ভিড় করে।

গোয়ার রাজধানী পানাজি। এক সময় পর্তুগীজদের উপনিবেশ ছিল গোয়া। এখানকার সরকারি ভাষা কোঙ্কনি। আয়তন তিন হাজার সাতশ দুই বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা চোদ্দ লক্ষ সাতান্ন হাজার সাতশ বত্রিশ। গোয়ায় অনুষ্ঠিত চলচ্চিত্র উৎসব আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে।

প্রশ্নবাণ

১.বসু বিজ্ঞান মন্দির কে প্রতিষ্ঠা করেন?
২.ঋষি অরবিন্দ তাঁর শেষ জীবন কোথায় কাটিয়েছেন?
৩.প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কোথাকার বাসিন্দা?
৪.পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী কে?
৫.কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কে?

উত্তর : ১. জগদীশ চন্দ্র বোস। ২. পণ্ডিচেরিতে। ৩. গুজরাট। ৪. মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫. মঞ্জুলা চেল্লুর।

ছবিতে অমিল খোঁজ

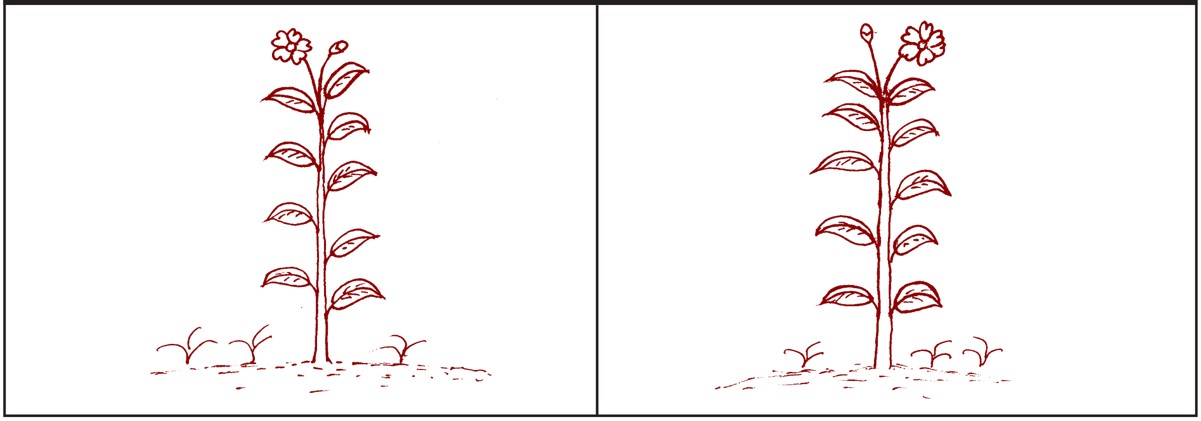

ছোটদের কলমে

ভালো বাঁদর

রিকি চক্রবর্তী, সপ্তম শ্রেণী

রায় বাড়ির ভালো বাঁদর
ধরতে পেলেই করে আদর,
নখগুলি তার ভীষণ খোঁচা
ভয় পায়না কোনো বাছা,

সকাল বিকেল পাড়ার মাঠে
খেলতে চলে সবার সাথে,
ডুগডুগি কেউ বাজিয়ে দিলে
নাচতে থাকে দু-হাত তুলে।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : ৮৪২০২৪০৫৮৪
E-mail : swastika5915@gmail.com

মেল করা যেতে পারে।

কর্পোরেট জগতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ছে

শুভশ্রী দাস

জল-স্থল-অন্তরীক্ষে মহিলারা দাপিয়ে বেড়ালেও কর্পোরেট জগতে তাদের যোগদান কিছুদিন আগেও কম ছিল। সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (সেবি) গত বছর ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ (এন সি ই)-এর আওতাভুক্ত কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট বিভাগকে নির্দেশ দিয়েছিল যে, ২০১৫-র ১ অক্টোবর পর্যন্ত তাদের বোর্ডে কমপক্ষে একজন মহিলাকে ডাইরেক্টর পদে নিযুক্ত করতে হবে। পরে সময় সীমা বাড়িয়ে ২০১৫-র ১ এপ্রিল করা হয়েছিল। সেবি'র চিফ ইউ কে সিনহা কোম্পানিগুলিকে নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন যে একজন মহিলাকে বোর্ডে রাখা আবশ্যিক; নির্দেশের অন্যথা হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাসত্ত্বেও ১৮৯ টি কোম্পানি সেবির নির্দেশ অগ্রাহ্য করেছে। সেবির তালিকায় মোট ১৭৫০টি কোম্পানি আছে। নির্দেশ অগ্রাহ্যকারী কোম্পানিগুলিকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

সেবির নির্দেশের আগে বোর্ডরুমে কোম্পানির মালিক নিজের স্ত্রী, কন্যা, পুত্রবধূদের নিয়োগ করতো। বোর্ডরুমে নিজের লোকদের রেখে তারা মনে করতেন মহিলাদের তাঁরা যথার্থ ন্যায় দান করে ফেললেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই অনুমান করা যায় যে মহিলাদের প্রতি কর্পোরেট জগৎ কত উদার! ইউরোপে সর্বোচ্চ ১০০ কোম্পানিতে ২৩ শতাংশের বেশি মহিলা ডিরেক্টর। আমেরিকার কোম্পানিগুলিতে এই সংখ্যা ২২ শতাংশ কিন্তু ল্যাটিন আমেরিকার অবস্থা খুব ভালো নয়। কর্পোরেট উইম্যান ডাইরেক্টরস্ ইন্টারন্যাশনাল- এর এক রিপোর্ট অনুসারে সেখানের ১০০টি বড় কোম্পানির মধ্যে ৪৭টি-তে কোনো মহিলা ডিরেক্টরই নেই।

বাকি কোম্পানিগুলিতে মহিলা ডিরেক্টরের গড় ৭ শতাংশের কাছাকাছি। এই দৃষ্টিতে ভারতের কর্পোরেট জগতের অবস্থা কিছুটা বদল হয়েছে। পেশাগত ভাব এসেছে। মেধার ন্যায্য উপযোগ হচ্ছে। তা সত্ত্বেও অন্ধকার দিক হলো ভারতীয় কর্পোরেট জগতে মহিলা প্রফেশনালদের সংখ্যা ৬ শতাংশ। জুনিয়র ম্যানেজমেন্ট স্তরে এই সংখ্যা ১৬ শতাংশ ও সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট স্তরে মাত্র ৪ শতাংশ।

কর্পোরেট জগতে উচ্চপদে অর্থাৎ লিডারশিপ শ্রেণীতে মহিলাদের অংশগ্রহণ প্রায় শূন্যের ঘরে। দেশের ৫৬ শতাংশ কোম্পানিতে যৌন উৎপীড়ন সম্পর্কিত বিধিবদ্ধ কোনো নিয়মনীতি চালু নেই। শারীরিক বা মানসিক অত্যাচারের জন্য মহিলাদের চাকরি ছেড়ে দেওয়ার আশঙ্কা গড়ে দ্বিগুণ। অর্ধেকেরও বেশি কোম্পানি মহিলাদের ওপর হওয়া অত্যাচারের বিষয়ে সমীক্ষা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া জরুরি মনে করে না। এ তথ্য পাওয়া গেছে সি আই আই-এর এক তাজা ও সামগ্রিক সমীক্ষা থেকে। তারা ৩০ কোটি টার্নওভার করা কোম্পানির মধ্যে ৪০০টিকে মহিলাদের ওপর হওয়া অপরাধ বিষয়ক প্রশ্ন পাঠিয়েছিল কিন্তু মাত্র ১৪৯টি কোম্পানি উত্তর দিয়েছে।

কোম্পানি যত বড় হতে থাকে মহিলা কর্মচারীর সংখ্যা তত কম হতে থাকে। অধিকাংশ কোম্পানিতে মহিলাদের জন্য আলাদা শৌচাগারের ব্যবস্থা নেই। অনেক কোম্পানি মহিলাদের ডে কেয়ার, ক্রেস, পিক অ্যান্ড ড্রপ অথবা ঘরে বসেই কাজ করার সুবিধা দিতে রাজি নয়। অর্ধেকেরও বেশি কোম্পানি মহিলাদের ম্যানুফ্যাকচারিং ও প্রোডাকশন বিভাগে নিযুক্ত করে না।

কর্পোরেট জগতে মহিলা ম্যানেজারদের ক্ষেত্র অনুসারে বিশ্লেষণের এক সমীক্ষায় জানা যায় যে, মহিলা ম্যানেজারদের মধ্যে অর্ধেক (৫৪ শতাংশ) ব্যাঙ্কিং, আর্থিক ও সেবা ক্ষেত্রে কার্যরত। ভারতে মহিলারা যতই উচ্চপদে কাজ করুক না কেন তাদের ঘরের কাজ থেকে মুক্তি নেই। অর্থাৎ দপ্তরের কাজ করেও ঘরের কাজ করতে হয়। মুম্বইয়ের অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের সি এ ডি শিখা শর্মার মতে, প্রতিভাবান মহিলাদের কেউ মা হওয়ার পর চাকরি পর্যন্ত ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। সামাজিক ও পারিবারিক পরিস্থিতি এখনো মহিলাদের পক্ষে অনুকূল হয়নি। তবু আশা করা যাচ্ছে, সেবির সক্রিয়তায় ভারতের কর্পোরেট জগতে বোর্ডরুম থেকে শুরু করে নীচে পর্যন্ত মহিলাদের পেশাদারিত্ব উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়ছে।

কোনো কিছু পছন্দ না হলেই ভদ্রতার আভরণ যদি খসে পড়ে তার চেয়ে পরিতাপের আর কিছুই নেই

অতিথি কলম

চেতন ভগত

সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের দেশব্যাপী যে তীব্র নিয়ন্ত্রণহীন, সম্পূর্ণ পারস্পরিক আস্থাহীন ও অসমাপ্ত বিতর্ক সমাজকে আলোড়িত করে তুলছে সেটি 'অসহিষ্ণুতা' নামক শব্দটিকে ঘিরে। অনেকেই গভীরভাবে চিন্তিত, অনেকেই তাদের অতীত অর্জিত পুরস্কার ফিরিয়ে দিয়েছেন। কেউ আবার নানান সংবাদমাধ্যমে বক্তব্য রাখছেন উত্তরপ্রদেশের দাদরির হত্যাকাণ্ড ঘিরে। কর্ণাটকের সমাজকর্মী কালবর্গীর হত্যাও অসহিষ্ণুতার উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। অন্য আর একটি পক্ষ কিন্তু বলে আসছে ভারত একটি সহিষ্ণু দেশ।

বাস্তবে কিন্তু আমরা খোলাখুলি অসহিষ্ণুতার বাড়বৃদ্ধি নিয়ে বিবাদ-বিসম্বাদ করতে পারছি। অনেক সময় এই নিয়ে সরাসরি সরকারকেও আক্রমণ করতে ছাড়ছি না। আদতে ১২৫ কোটি মানুষের দেশে যেখানে বহুক্ষেত্রে সংস্কৃতিগতভাবে যোজন সমান ফারাক

> **কোনো কিছু অপছন্দ হলেই নিজের ভদ্র কথাবার্তা বা সামাজিক আচরণকে সঙ্গে সঙ্গে অসামাজিক করে তোলাটা কখনই সমর্থনযোগ্য নয়। আর এটা ঘটলেই বোঝা যায় অসহিষ্ণুতাজনিত হিংস্রতা ও কুৎসিত ব্যবহার সমাজের কতটা ক্ষতি করে।**

সত্ত্বেও আমরা দিব্যি নিরুপদ্রবে দৈনিক কার্য সমাধা করে জীবিকা নির্বাহ করে চলেছি। যা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করে আমরা অবশ্যই একটি সহিষ্ণু দেশ। অবশ্য অগুনতি বিতর্কসভাগুলিতে উভয়পক্ষই তাঁদের যুক্তি সাজাতে এত তৎপর যে অন্যপক্ষের বক্তব্যের তোয়াক্কাই করছে না। এটি কিন্তু সত্যিই অসহিষ্ণুতার ইঙ্গিতবাহী। কিন্তু প্রশ্নটা থেকেই যায়— ভারত কি সহিষ্ণু দেশ না অসহিষ্ণু? এখানে একটা তাৎপর্যপূর্ণ জিজ্ঞাসা তোলা যায়— আমরা কি তেমন সহিষ্ণু যে অনায়াসে বলতে পারি ওপরের দুটো বক্তব্যই সত্যি?

বাস্তবে কিন্তু প্রশ্নটি থেকেই জন্ম নেয় বিভ্রান্তি। অসহিষ্ণুতা কখনই একই ধরনের ছাঁচে ঢালা হয় না। যেমন একই সঙ্গে দেশের মধ্যে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, জাতিগত অসহিষ্ণুতা, অর্থনৈতিক বৈষম্য সংক্রান্ত অসহিষ্ণুতা, রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা, যানবাহন সংক্রান্ত অসহিষ্ণুতা, সর্বোপরি বিকল্প মতামত পোষণের অসহিষ্ণুতার মতো আরও নানান প্রজাতির অসহিষ্ণুতার সহাবস্থান আমরা দেখি।

একটা ছোট্ট উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, আমরা গাড়ি চালাবার সময় বা আমার পাশের গাড়ির চালক সামনের গাড়ির উদ্দেশ্যে তারস্বরে হর্ন বাজাতে শুরু করি (পৃথিবীর সমস্ত উন্নত দেশসহ অন্যান্য এশিয়ার দেশগুলিতেও গাড়ি-চালকরা এমন হর্ন বাজান না)। এ থেকে সহজেই আমাদের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। আজকালকার টুইটার অ্যাকাউন্টগুলিতে যে কর্কশ, গালমন্দভরা বিদ্বেষমূলক মতামত অকাতরে ছড়িয়ে দেওয়া হয় তা থেকে অতি সহজেই বোঝা যায় আমরা অন্যের মতামতকে আদৌ যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে আলোচনা করতে তৈরি নই। তার মানে কিন্তু এটা ধরে নিলে একেবারেই ভুল হবে যে আমরা সকলেই অসহিষ্ণু।

দেশের বহু নাগরিকই তাঁদের গাড়ির হর্ন ন্যূনতম ক্ষেত্রেই বাজাবার চেষ্টা করেন (কিছু নির্বোধ লোকজনই রাস্তাঘাটগুলিতে হর্নের কুৎসিত শব্দ দূষণ ছড়িয়ে দেন)। একইভাবে টুইটারের ক্ষেত্রেও গরিষ্ঠাংশ ব্যবহারকারীই গঠনমূলক ও সৎ উদ্দেশ্যেই এটি ব্যবহার করেন। ধর্মীয় সহিষ্ণুতার ক্ষেত্রেও বিষয়টি একই রকমভাবে সত্যি। সব ভারতীয় সব ধর্মকেই সমান পছন্দ না করলেও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সঙ্গে আনন্দেই বসবাস করে।

তাহলে আমরা একটি সমাজকে কি

চটজলদি অসহিষ্ণু সমাজের তকমা লাগিয়ে দেব? না কি একবাক্যে মেনে নেব এটি সম্পূর্ণ সহনশীল সমাজ যদিও আমাদের সামনেই বেশ কিছু অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে চলেছে। না কি আরও একটা দিক থেকে ভেবে বলা যে বাস্তবে এটিই একটি আদর্শ সমাজ যেখানে সকল মতের সহাবস্থানীরা নিজেদের আরও পরিণত করে তুলতে তৎপর। অবাক হয়ে দেখতে হয় উত্তপ্ত বৈদ্যুতিন বা প্রিন্ট মিডিয়ার বিতর্কগুলিতে এ পথে কেউ বিতর্ক চালান না। ভাবা দরকার আমরা ভারতীয়রা কীভাবে দেশকে আরও সহিষ্ণু করে তুলতে পারি। এটা করতে গেলে প্রথমেই বুঝতে হবে সহিষ্ণুতার মনস্তত্ত্বটিকে। সেই সঙ্গে রাজনীতির সঙ্গে যতটা সম্ভব এই সহিষ্ণুতাবোধকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে হবে। অভিধান অনুযায়ী সহিষ্ণুতার অর্থ ''মত বা ব্যবহার যার সঙ্গে আমি অভিন্নতা পোষণ করি বা অপছন্দ করি তার অস্তিত্বকে অস্বীকার না করার মানসিক ক্ষমতা বা আগ্রহ''।

এখন দেখা দরকার যে তিনটি স্তর পরম্পরায় সমাজে এই সহিষ্ণুতার ধারণা কাজ করে। (১) সমাজে বহু জিনিসই রয়েছে যা আমার অপছন্দের বা বিরক্তির উদ্রেক করে, (২) এই ধরনের বিরক্তিকর জিনিসগুলির ক্ষেত্রে আমরা নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া জানাই এবং (৩) আমাদের এই প্রতিক্রিয়াজনিত কাজ অনেক সময় সমাজে হয়ত একটা নির্দিষ্ট ধারণা বা আশঙ্কার সৃষ্টি করতে পারে। প্রথম ধাপটি যা আমাদের বিরক্ত করে সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সেটিকে নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত করা সর্বাপেক্ষা জরুরি। আমাদের পক্ষে বাস্তবে কখনই এমন একটা সমাজে বাস করার কথা ভাবা যায় না যেখানে কিছুই আমাদের বিরক্ত বা বিক্ষুব্ধ করবে না। খারাপ রাস্তাঘাট, দুর্নীতি, অকর্মণ্যতা, উচ্চপদে মধ্যমেধা, গড্ডালিকা প্রবাহ বা দারিদ্র্যের মতো বস্তুগুলি কি আমাদের খারাপ লাগার তালিকার পক্ষে যথেষ্ট নয়? কিন্তু এই ক্ষেত্রগুলিতে আমরা যথার্থই সহিষ্ণু। আমরা প্রায়শই দুর্নীতিগ্রস্ত ও অপদার্থ নেতাকে নির্বাচিত করি। করি না কী?

কিন্তু আগে বলা অনেক কিছুকে মেনে নিলেও অন্য ধর্মমত, ভিন্নরাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ, সংস্কৃতি বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আমরা বিরক্ত হয়ে পড়ি। আমি বলছি না আমাদের সেগুলিকে কায়মনোবাক্যে ভালবাসতে হবে। তবে সেগুলির সঙ্গে সহাবস্থান করে নিজের ও অন্যের বাঁচা সুনিশ্চিত করাটা তো জরুরি। আর প্রাথমিকভাবে এটুকু করতে পারলেই অসহিষ্ণুতার বীজ থেকে আর গাছই বেরোবে না। এটা মুখে বলা সোজা কিন্তু কাজে করতে গেলে প্রথমেই দীর্ঘস্থায়ী শিক্ষাপ্রণালীর মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন মতামত ও বিশ্বাসের সঙ্গে সমাজকে পরিচিত করাতে হবে। পৃথিবীর বিচিত্র সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারলেই দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। দেশে সংবাদ মাধ্যমগুলির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও নাগরিকদের তার সুফল গ্রহণ করার মাধ্যমে এই পরিচিতি শুরু হয়েছে। দেশ থেকে অন্য দেশে কর্মসূত্রে যাতায়াতও বেড়েছে। তাই পরিবর্তন ঘটছে তবে ধীরে।

এইবার দ্বিতীয় ধাপটির কথা। কী কী বিষয়ে আমরা বেশি বিরক্ত হয়ে পড়ছি— কথা যখন বলা হলো তখন বলা দরকার এই বিরক্তির বহিঃপ্রকাশ কীরকম হবে। আমরা কি হুঙ্কার দিয়ে উঠব? আমরা কি সঙ্গে সঙ্গে কাউকে আঘাত করব? আমরা কি গালমন্দ পাড়তে শুরু করব? না কি আমরা আমাদের আবেগকে সংযত রাখব? আমরা কি এরকমটা করা অভ্যাস করতে পারব যখন এটা বলা সম্ভব হবে যে ওই ভদ্রলোক যা বলছে বা করছে তা আমি আদৌ পছন্দ করছি না, ওর সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ ভিন্নমত, কিন্তু আমি তাই বলে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব না বা অভদ্রভাবে গালিগালাজও করব না। কিন্তু সত্যি বলতে কী আমাদের পক্ষে এমনটা ঘটানো বেশ কঠিন। কোনো ঘটনায় তেমনভাবে মুষড়ে পড়লে অন্যপক্ষের ওপর দুর্ব্যবহার করাটা আমরা সংস্কৃতিগতভাবেই মেনে নিয়েছি। এখানে একটু বদল আনতেই হবে। তাই বলছি কোনো কিছু অপছন্দ হলেই নিজের ভদ্র কথাবার্তা বা সামাজিক আচরণকে সঙ্গে সঙ্গে অসামাজিক করে তোলাটা কখনই সমর্থনযোগ্য নয়। আর এটা ঘটলেই বোঝা যায় অসহিষ্ণুতাজনিত হিংস্রতা ও কুৎসিত ব্যবহার সমাজের কতটা ক্ষতি করে।

প্রথমত, তা সমাজে একটা তীব্র আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করে। একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ লক্ষ্য মানুষের মনে ভয়ের জন্ম দেয়। আবার যে মিডিয়ার সদ্ব্যবহারের কথা আগে বলেছিলাম তাদের অতি তৎপরতার কারণে এই ঘটনার খবর আগুনের মতো দেশব্যাপী ছড়িয়ে শুধু নয় অতিরঞ্জিত হতে হতে মারাত্মক অভিঘাতের সৃষ্টি করতে পারে।

এখানে সর্বোচ্চ নেতৃত্বের একটা ভূমিকা থেকে যাচ্ছে। একথা কখনই ঠিক নয় যে কোনো হানাহানির ঘটনা ঘটলেই সরকারের তরফে সঙ্গে সঙ্গে মতামত ব্যক্ত করতে হবে। তবে এমন কোনো ঘটনা যেখানে দেশের লক্ষ লক্ষ নাগরিকের মনে আশঙ্কা সৃষ্টির ইন্ধন রয়ে গেছে তেমন ক্ষেত্রে অবশ্যই একেবারে সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে অত্যন্ত দ্রুত হস্তক্ষেপ করতে হবে।

সবশেষে আশা রাখব যখন ভারতীয়রা বিরক্ত হওয়ার মতো যথার্থ কারণগুলিতেই বিক্ষুব্ধ হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিদেনপক্ষে আমাদের প্রতিক্রিয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে একটু ঠাণ্ডা গলায় প্রত্যুত্তর দিই। সর্বোচ্চ নেতৃত্বের সঙ্গে মিডিয়ারও দেখা দরকার বিপুল জনগোষ্ঠীর মধ্যে আশঙ্কা তৈরির আগেই যেন ঘটনা বা খবরটির অপমৃত্যু হয়। মনে রাখতে হবে আমরা একটি মিশ্র সমাজ কখনই একমাত্রিক নয়। সহিষ্ণু-অসহিষ্ণু আমরা একাধারেই। এটা মেনে নিয়ে চলতে কোনো ক্ষতি নেই।

(লেখক সংবাদ ভাষ্যকার)

বর্তমান কাঠামোয় সংরক্ষণ বিধি অসাংবিধানিক

তারক সাহা

বিভিন্ন মিডিয়ায় বিহারের নির্বাচনী বিশ্লেষণের যে ফলাফল বেরিয়েছে তাতে বিজেপির পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে সঙ্ঘ বিরোধী শিবির নির্বাচনের প্রাক্কালে আর এস এস-এর সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবতজীর সংরক্ষণ বিরোধী মন্তব্যকে দুষছে। এই প্রসঙ্গে দেখতে হবে— তিনি ঠিক কী বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, বর্তমান সংরক্ষণ বিধিতে তপশীলি জাতি, উপজাতিদের মধ্যে যারা সুবিধাভোগী অংশ তারাই এক তরফাভাবে সুবিধা পেয়ে আসছে। পিছিয়েপড়া বর্গের মানুষজন যাদের জন্য এই সংরক্ষণবিধি সুনির্দিষ্ট তাদের এক বিরাট অংশ এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এই সুবিধা ভোগীদের মধ্যে রয়েছে রামবিলাস পাসোয়ান, জিতনরাম মাঝি, লালুপ্রসাদ যাদবের মতো অংশ। তাই প্রশ্ন উঠেছে, সংরক্ষণভোগীরা কেন অনন্তকাল ধরে এই সুবিধা পেয়ে যাবেন?

স্বভাবতই এই শ্রেণীর মানুষজন কুপিত। মোহনজী যা বলেছেন বেশ কিছুকাল আগে দেশের উচ্চতম আদালতও একই কথা বলেছে। আসলে মোহনজীর মতামত একইভাবে অনুরণিত হয়েছে সুপ্রীম কোর্টের ২৮ অক্টোবরের (২০১৫) পর্যবেক্ষণে। বিচারপতি দীপক মিশ্র এবং পিসি পন্থের বেঞ্চ বলেছে যে, কেন্দ্র ও রাজ্য নিশ্চিত করুক সুপার স্পেশালিটি কোর্সে জাতপাত নয় বরং বিচার্য হোক মেধা। শীর্ষ আদালতের এই অভিমত এসেছে অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যে সুপার স্পেশালিটি মেডিকেল কোর্সে ভর্তির প্রসঙ্গে।

দেশের উচ্চতম আদালতের এহেন পর্যবেক্ষণ স্পষ্টত দু-ভাগে বিভক্ত করেছে সংরক্ষণ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে থাকে এমন লোকজনদের। প্রশ্ন উঠছে এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা আমাদের মৌলিক অধিকারকে খর্ব করেছে, যদিও এই ব্যবস্থা সংবিধান স্বীকৃত। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪, ১৫, ১৬-তে বর্ণিত মৌলিক অধিকার প্রতিটি নাগরিকদের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। এগুলি হলো— (১) সমান অধিকার, (২) বিশেষ স্বাধীনতা, (৩) বঞ্চনার বিরুদ্ধে অধিকার (Right against exploitation), (৪) ধর্মাচরণের অধিকার, (৫) সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষার অধিকার, (৬) সম্পত্তির অধিকার এবং (৭) সাংবিধানিক সুবিধা পাবার অধিকার।

যা অনৈতিক তা অনেক ক্ষেত্রে সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায়। যেমন ধরা যাক, এ রাজ্যের ক্ষেত্রে সারদা মামলায় অভিযুক্ত মন্ত্রী মদন মিত্র বন্দি। বন্দি দশায় মন্ত্রী থাকা অনৈতিক। সাজাপ্রাপ্ত না হলে যদিও বা মন্ত্রী বা বিধায়ক থাকা যায়, কিন্তু সাজাপ্রাপ্ত বিধায়ক বা মন্ত্রী তার পদে বহাল থাকবে এমন বৈধতা দেয়নি সংবিধান। তবুও এরা বহাল তবিয়তে আছে।

আমাদের দেশের পলিটিক্যাল ক্লাস তাদের সুবিধামতো সংবিধানের ব্যাখ্যা করে থাকে। সংরক্ষণ ব্যবস্থা উঠে গেলে বিপাকে পড়বে বেশী সেই সব শ্রেণী যারা বিগত ৬৮ বছর ধরে সুবিধা পেয়ে আসছে। ৬৮ বছর ধরে যেসব শ্রেণী সুবিধা পায়নি, তাদের কাছে আজও অধরা সংরক্ষণ বিধি। সুতরাং লালু, রামবিলাস, জিতন মাঝিদের কুম্ভীরাশ্রু যতটা না দলিতদের জন্য তার চেয়ে বেশি দরকার নিজেদের বিপন্ন অস্তিত্বকে রক্ষা করা। মোহনজী রাজনীতি করেন না, তাই তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সংরক্ষণ বিধির সমালোচনা করতে পারেন।

এবার ফিরে আসা যাক মৌলিক অধিকারের প্রশ্নে। সংবিধান-ই বলছে, রাষ্ট্র কখনই ধর্ম, জাত-পাত ভিত্তিতে, লিঙ্গ বৈষম্য বা জন্মস্থান নিয়ে কোনো অবিচার করবে না তার নাগরিকদের প্রতি। সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদ বলছে সরকারি চাকরিতে সকলের সমান অধিকার থাকবে। তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? প্রথমত, সংবিধান বলছে রাষ্ট্র জাত-পাতের ভিত্তিতে কাউকে সরকারি চাকরি থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। আবার সেই সংবিধান জাত-পাতের লড়াইকে উসকে দিয়ে দলিতদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করল। অবশ্য সংবিধান প্রণেতারা সংরক্ষণ ব্যবস্থা এক দশকের জন্য নির্দিষ্ট করলেও স্বাধীনতার পর ৬টি দশক অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তা বহাল তবিয়তে রয়েছে। আমাদের দেশের পলিটিক্যাল

> “সংরক্ষণব্যবস্থা কোনো গর্হিত ব্যবস্থা নয়। কিন্তু আমাদের দেশে পুরো ব্যবস্থাটাই গোলমেলে এবং রাজনৈতিক নেতাদের কাছে যখন কোনো নীতি বা কর্মসূচি থাকে না তখন তাদের হাতিয়ার হায়ে ওঠে এই ব্যবস্থাই।”

ক্লাসের আছে— Hypocrisy prevails over Democracy। অর্থাৎ গণতন্ত্রের ওপর দিয়ে চলছে ভণ্ডামি।

শ্রীভাগবত সওয়াল করেছেন সংরক্ষণ হোক জাত-পাত নয় অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য। সংরক্ষণ যে শুধু এদেশে রয়েছে তা নয়, রয়েছে মার্কিন মুলুকে, চীন ও ব্রিটেনেও। এমনকী পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ডের মতো দেশগুলিতেও। টাটা ইন্সটিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্সের কর্তা জি. ওয়াংখাড়ের মতে, নিউজিল্যান্ডে সংরক্ষণ রয়েছে জাতিগত অল্প সংখ্যকদের জন্য। পাকিস্তানে শহুরেদের জন্য কুড়ি শতাংশ আসন। চীনে ধর্মীয় এবং জাতিগত অল্পসংখ্যকদের জন্য চাকুরি এবং ছাত্রাবাসে সংরক্ষণ রয়েছে।

সুতরাং সংরক্ষণব্যবস্থা কোনো গর্হিত ব্যবস্থা নয়। কিন্তু আমাদের দেশে পুরো ব্যবস্থাটাই গোলমেলে এবং রাজনৈতিক নেতাদের কাছে যখন কোনো নীতি বা কর্মসূচি থাকে না তখন তাদের হাতিয়ার হয়ে ওঠে এই ব্যবস্থাই। শ্রী ভাগবত যে সংরক্ষণের কথা বলেছেন তা কোনো নতুন নয়। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতাকে যদি মাপদণ্ড করা হয় তবে তা অনুচ্ছেদ ১৫ এবং ১৬-র পরিপূরক। এখানে যেমন সরকারি চাকরিতে মেধা প্রাধান্য পাবে, বাড়বে উৎকর্ষতা এবং এই ব্যবস্থায় হিন্দু, মুসলমান, শিখ, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ সমান অধিকার পাবে।

সুপ্রীম কোর্ট স্পষ্টতই সুপার স্পেশালিটি চিকিৎসা শিক্ষায় কোটা সিস্টেমকে পত্রপাঠ নাকচ করেছে। আদালত বলেছে, আদালত কখনই কম মেধার ছাত্র-ছাত্রীদের দরাজ হাতে মানুষ মারার লাইসেন্স দিতে পারে না সুপার-স্পেশালিটি কোর্সে কোটা ব্যবস্থা বহাল রেখে। জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার মাধ্যমে যেসব ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ বিধি মেনে ভর্তি হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে তারা ইংরেজী বুঝতে পারে না, ১ম বর্ষ এমনকী ১ম সিমেস্টার পরীক্ষায় এদের অনেকেই কৃতকার্য হয় না। অথচ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি চাপের কাছে মাথা নত করে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ‘শূন্য’ পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি করতে বাধ্য হচ্ছে। আর এসব কারণেই এদেশের শিক্ষার মানের অবনমন ঘটছে বিশ্ব-মানের তুলনায়।

ভারতের সংরক্ষণ নীতি একেবারে কাজ করেনি এমনটা মানতে নারাজ জি. ওয়াংখাড়ে। তাঁর মতে কিছু মানুষ অবশ্যই উপকৃত হয়েছে বটে, কিন্তু ভ্রান্ত সরকারি কর্মসূচি রূপায়ণে এর সুফল পৌঁছোয়নি দেশের প্রত্যন্ত মানুষের কাছে যারা আজও পিঁপড়ের ডিম সেদ্ধ খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। আর যারা এর সুফল পেয়েছে তারা সারাজীবন বংশপরম্পরায় তা ভোগ করবে এমনটাও চলতে দেওয়া যায় না।

অন্য এক বর্গের মতে, অনেক আইন স্বাধীনোত্তরকালে রচিত হয়েছে যাদের সাহায্যে পিছড়ে বর্গ এবং অল্প সংখ্যকদের স্বার্থ সুরক্ষিত হলেও কোটার ফলে নষ্ট হচ্ছে মেধার স্বীকৃতি। যদি কোটার মাধ্যমে সাধারণ মেধার ছাত্র বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়, তবে বঞ্চিত হয় মেধা।

তাহলে এই বিতর্কের শেষ কোথায়? বিশেষজ্ঞদের মতে, সংরক্ষণ থাক তবে তা হোক সময়সীমাভিত্তিক। প্রতি ৫-৬ বছর অন্তর পর্যালোচনা হোক কতটা উপকৃত হয়েছে তারা যারা এই সংরক্ষণ তালিকাভুক্ত।

বর্তমান সরকার বিভিন্ন স্তরে এই সংবিধান বিরোধী ব্যবস্থাকে জিইয়ে রাখবে নাকি বিতর্ক চালিয়ে এর অবসান ঘটাবে? রাজনীতির লাভ-লোকসান বিচার না করে এই ব্যাপক সমস্যার সমাধান কীভাবে করা যায় তা এখন দেখার। ■

সবার প্রিয়
বিল্লদা ®
চানাচুর

‘বিল্লদাকুঞ্জ’
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

Swachchha Bharat Swabolombee Bharat
How to build a nice home, think of us
WE PROVIDE :-

+ Low Cost readymade Latrine (Toilet) + Low Cost House
+ Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant
+ Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES

"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12, 71,
Park Street, Kolkata - 700 016
M : 98311 85740, 98312 72657,
Visit Our Website : www.calcuttawaterproofing.com

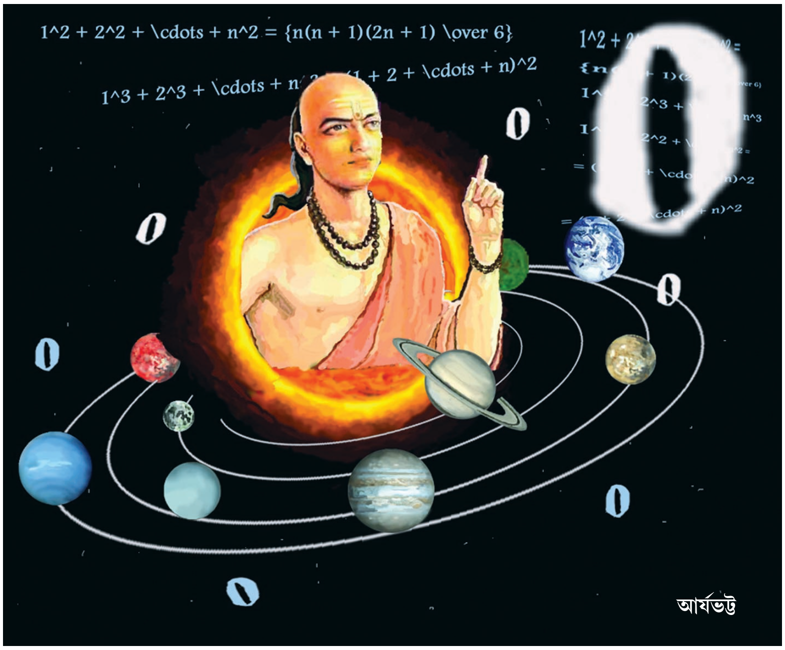

আর্যভট্ট

প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান চর্চা-২

দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত

ভারতবাসীদের মধ্যে অতি নগন্য সংখ্যক মানুষই প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান সম্পর্কে অবহিত। পাঠক্রমের কথা ছেড়ে দিয়ে যদি পাঠ্যপুস্তকের কথায় আসি, তাহলেও বলতে হয় যাঁরা পাঠ্যপুস্তকগুলি সরকার নির্ধারিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে লিখেছেন, তাঁরা ভারতীয় বিজ্ঞানীদের নামই কোথাও উল্লেখ করেননি। যেমন— মাধ্যাকর্ষণ অভিকর্ষ বিষয়ে যখন নিউটনের কথা হয়— তখন স্বাভাবিক ভাবেই নিউটনের জন্মের ৫০০ বছর আগে ভারতীয় বিজ্ঞানী ভাস্করাচার্যের নাম উল্লেখ করা যেত। এরকম অনেক উদাহরণই দেওয়া যায়। এই প্রবন্ধ পাঠকালে পাঠকরা কিছুটা জানতে পারবেন।

কাব্য, দর্শন-এর আলোচনায় প্রাচীন ভারতীয়রা উন্নতির শীর্ষে ছিলেন যেমন সত্য, তেমনি সত্য যে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিজ্ঞানীদের মতো উচ্চমার্গের বিজ্ঞানীও পৃথিবীর কোনো দেশে ছিলেন না। শুধু পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞান নয়, গণিত শাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যায় ভারতের উৎকর্ষ অবিসংবাদিত ছিল।

পাটিগণিত সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের বিজ্ঞান এবং পাটিগণিতে সর্বাধিক ব্যুৎপন্ন ভারতেরই ছিল। ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা ও '০' শূন্য আবিষ্কারের স্থান অক্ষর আবিষ্কারের পরেই অর্থাৎ দ্বিতীয় বৃহত্তম আবিষ্কার যার জন্য আধুনিক যুগকে ঋণ স্বীকার করতেই হবে! আমেরিকার অধ্যাপক হ্যালস্টেড লিখেছেন, ১ থেকে ৯ এবং শূন্য (০) ধরে অর্থাৎ দশ ধরে গণনা পদ্ধতি আবিষ্কারের ফলেই হিন্দুরা গণিতে গ্রীকদের থেকে বেশী উন্নতি লাভ করেছিলেন।' ঐতিহাসিক এলফিনস্টোন তাঁর ভারত ইতিহাসে লিখেছেন, ''হিন্দুরা পাটিগণিতে সর্ববাদী সম্মত দশ ধরে গণনা পদ্ধতির জন্য বিখ্যাত এবং মনে হয় এটাই গ্রীকদের তুলনায় পাটিগণিতে তাদের এত বেশি উন্নতির কারণ।''

এই সংখ্যা গণনা পদ্ধতি নাকি ইউরোপ শিখেছিল আরবদের কাছ থেকে। কিন্তু আরবীয়রা নিজেরাই একে হিন্দু সংখ্যা বলে স্বীকার করে। ঐতিহাসিক কোলব্রুক বলেছেন, 'আরবরা স্পষ্টতই বিজ্ঞানে অধর্ম এবং তাদের নিজেদের স্বীকৃতি অনুসারেই এটা নিশ্চিত যে তারা এই সংখ্যা গণনা পদ্ধতি হিন্দুদের কাছ থেকে শিক্ষা করেছিল।'

ম্যাকডোয়েল তাঁর সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে লিখেছেন, 'বিজ্ঞানেও ভারতবর্ষের কাছে ইউরোপের ঋণ যথেষ্ট। প্রথমত, জগতে প্রচলিত সংখ্যা হিন্দুদের আবিষ্কার। শুধু অঙ্ক শাস্ত্রের নয় সমস্ত সভ্যতার ক্রমবিকাশের উপর, এই দশ ধরে গণনা পদ্ধতি আবিষ্কারের প্রভাব অপরিসীম। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে ভারতীয়রা পাটিগণিত ও বীজগণিতে আরবদের এবং তাদের মারফতে পাশ্চাত্য জাতি সমূহের শিক্ষাদাতা হয়েছিল।'

এই দশ ধরে গণনা পদ্ধতিকে ইংরাজীতে Decimal notation বলা হয়। হিন্দুরা Decimal notation আবিষ্কার করলেও দশমিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেনি কোনও হিন্দু গণিতজ্ঞই দশমিক বিন্দুর ব্যবহার করেননি— এমনকী হিন্দু গণিত প্রতিভার ভাস্কর—ভাস্করাচার্যও নন।

যদিও সুপণ্ডিত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল পতঞ্জলির ব্যাসভাষ্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে হিন্দুরা দশমিক পদ্ধতি জানতেন তবু একথা সত্য বলে মনে হয় না। অধ্যাপক হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লীলাবতী পুস্তকের ইংরাজী সংস্করণে বলেছেন, ভাস্করাচার্যের সময়ে (দ্বাদশ শতাব্দী) হিন্দু পণ্ডিতেরা দশমিক ব্যবহার জানতেন না। অঙ্কশাস্ত্রে মৌলিক গবেষক সুপণ্ডিত বিভূতিভূষণ দত্ত মনে করেন যে হিন্দুরা দশমিক বিন্দুর ব্যবহার জানত না।

হিন্দুরা পূর্ণ সংখ্যার যোগ, বিয়োগ, পূরণ, ভাগ, বর্গ, বর্গমূল, ঘনমূল, ঘন— এই আট প্রকার প্রণালী জানত। মধ্যযুগে ইউরোপে ভাগকে খুব শক্ত জিনিস মনে করা হোত, কিন্তু হিন্দুদের কাছে তা বেশ সহজ ছিল। বর্তমান ভাগের প্রণালী হিন্দুদের আবিষ্কার। বর্গমূল ও ঘনমূল

বের করবার বর্তমান নিয়মও হিন্দুদের দান। যে সমস্ত সংখ্যার বর্গমূল পূর্ণ সংখ্যা হয় না, তাদের নিকটতম বর্গমূল বের করার প্রণালী জানত। কোনো দুই বা ততোধিক সংখ্যার পূরণ ফল ঠিক হয়েছে কিনা স্থির করার জন্য $৯^{৯}$ বাদ দিয়ে যে নিয়ম রয়েছে তাও হিন্দুদের।

হিন্দুরাই প্রথম ত্রৈরাশিক আবিষ্কার করে। কিন্তু ঠিক কোন সময়ে আবিষ্কৃত হয়েছে জানা যায়নি। তবে আর্যভট্ট (পঞ্চম শতাব্দী) প্রণীত গ্রন্থে ত্রৈরাশিকের নিয়ম পাওয়া যায়। আরবরা ত্রৈরাশিকও হিন্দুদের কাছে শিখেছিল। ভগ্নাংশ সম্বন্ধেও হিন্দুদের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। ল.সা.গু. (লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক) নিয়ম হিন্দু গণিতজ্ঞ মহাবীর (নবম শতাব্দী) তার গণিত-সার সংগ্রহে এই নিয়ম ব্যবহার করেছেন। ল.সা.গু.-র নাম দিয়েছেন 'নিরুদ্ধ'।

হিন্দুরা অতি প্রাচীনকাল থেকেই ছন্দগণিত (Permutation and Combination) জানত। বিভিন্ন রকমের বৈদিক ছন্দ ঠিক করার জন্যই তাদের দৃষ্টি এদিকে পতিত হয়। পিঙ্গলের (খৃ. পূ. দ্বিতীয় শতাব্দী) ছন্দশাস্ত্রে এ বিষয়ে নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। শ্রেঢী (Arithmatical and Geometrical Progression) ব্যবহারও হিন্দুরা জানত। আর্যভট্টের গ্রন্থে এ সম্বন্ধে সাধারণ নিয়মও রয়েছে। কোনো সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে যে অনন্তরাশি হয় ভাস্করাচার্যের লীলাবতীতে তা পাওয়া যায়।

ধর্ম হিন্দুদের জ্ঞান লাভের প্রেরণা যুগিয়েছে। ঠিক সময়ে ধর্মকার্য করার জন্য হিন্দুরা জ্যোতিষশাস্ত্রের ভালোমতন চর্চা শুরু করে। গণিতে ব্যুৎপত্তি না থাকলে জ্যোতিষশাস্ত্রে পণ্ডিত হওয়া যায় না। ভাস্করাচার্য তাঁর সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থে লিখেছেন যে দুই প্রকারের গণিতশাস্ত্রে (ব্যক্ত ও অব্যক্ত) অভিজ্ঞ হলে তবে জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ করার অধিকারী হওয়া যায়। উপমা দিয়ে বলেছেন—

ভোজ্যং যথা সর্বরসং খিলাজ্যং
রাজ্যং যথা রাজ বিবর্জিতং চ।
সভা ন ভাতীব সুবক্তা হীনা
গোলালো ভিজ্ঞো গণকস্তথাস্ত্র।

ঘৃত ভিন্ন যেমন খাদ্য, রাজাশূন্য রাজ্য যেমন, সুবক্তাহীন সভা যেমন, গণিত শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ গণকও তেমন।

ভাস্করাচার্য

তাই আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্যের জ্যোতিষশাস্ত্রের পুস্তকে গণিতের বিশদ আলোচনা আছে।

প্রাপ্ত পুস্তকগুলির মধ্যে আর্যভট্টতন্ত্রই এ বিষয়ে প্রাপ্ত পুস্তকগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে আর্যভট্ট এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থ থেকে বুঝতে পারা যায় যে, এই বিষয়ে তিনিই ভারতের প্রথম লেখক নন। তাঁর আগেও এই বিষয়ে ভারতে গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। কিন্তু আর্যভট্টের পূর্ববর্তী কোনো লেখকের গ্রন্থ পাওয়া যায়নি।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও উল্লেখ করতে হয় যে আজকাল কোনো মেধাবী ছাত্রের পক্ষেও এই বয়সে কোনো মৌলিক গবেষণা করে ওই জাতীয় গ্রন্থ লেখা সম্ভব নয়, যেহেতু একটি বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করতে অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হয়। মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হলে অনেক সময় বেঁচে যায়। উইলিয়াম হেনরী পারকিন নামক এক রাসায়নিক মাত্র ১৮ বছর বয়সে ম্যাজেন্টা নামে কৃত্রিম রঙ্ আবিষ্কার করেন। ইংরাজী ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা করতে হয় বলে কোনো বাঙালি ছাত্রের পক্ষে ওই বয়সে মৌলিক গবেষণা করার সুযোগ হয় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় যে বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ওই বয়সে গণিত শাস্ত্রে কিছু মূল্যবান গবেষণা করে বিদেশে গণিত পণ্ডিতদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। যার জন্য বলা হয়, আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে ও অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকায় পৃথিবী একজন গণিতজ্ঞকে হারিয়েছে।

আর্যভট্ট কুসুমপুর বা বর্তমান পাটনায় এই গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থের নাম আর্যভট্ট তন্ত্র। ওই সময়ে, সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে পাটনা অঞ্চলের মাতৃভাষা বা প্রাকৃতের তফাত বড় একটা ছিল না। সে সময় বলতে না পারলেও সংস্কৃত সকলে বুঝত।

(সংগ্রাহক : অমলেশ মিশ্র)

অন্য রকম

সাজির স্বপ্নের উড়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ শৈশবে বাচ্চারা যখন খেলার মাঠ দাপিয়ে বেড়ায় তখন তার চোখ থাকতো আকাশপানে। খেলার মাঠে বা ঘরেই হোক তার নজর থাকত আকাশের দিকে। তার মন যেন সবসময় আকাশে উড়ে বেড়াতে চাইত। মূক ও বধির শিশুটি কখনো কাউকে বুঝিয়ে উঠতে পারেনি তার স্বপ্ন কী। স্বপ্ন ছিল আকাশে ওড়ার। যখন তার বয়স বাড়ল তখন স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার ইচ্ছেটা আরও জাঁকিয়ে বসলো। জেদ চাপলো যে করেই হোক সফল তাকে হতেই হবে। দারিদ্র্য সত্ত্বেও নিজের জেদকে বজায় রেখেছিল সাজি থমাস। পেশায় গ্যারেজের মেকানিক থেকে আজ তিনি হেলিকপ্টার তৈরির কারিগর।

স্বপ্ন দেখলে স্বপ্নকে সত্যি করতে হয় একথা কোথাও উল্লেখ না থাকলেও নিজের উদ্যম দিয়ে তা করে দেখানোটাই আসল চ্যালেঞ্জ। কেরলের ইদুক্কি জেলার থাট্টাকুজা গ্রামে বেড়ে ওঠা সাজি শৈশব থেকেই দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করেছে। কিন্তু হাজার কষ্টের মধ্যেও স্বপ্ন তাঁর পিছু ছাড়েনি। বছর পাঁচেক বয়স থেকেই পিচবোর্ড দিয়ে ছোট ছোট খেলনা বাস আর এরোপ্লেন তৈরি করত সে। কিন্তু তাঁর এই প্রতিভাকে কেউ কখনও গুরুত্ব দিয়ে দেখেননি। এমনকী তাঁর বাবাও ভেবেছিলেন বেশি লেখাপড়া করে লাভ নেই। ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়াই যথেষ্ট। তাঁর বাবা কোনোদিন ভাবেননি তাঁর তিন ছেলে-মেয়ের মধ্যে সাজিই একদিন তাঁকে গর্বিত করবে। তাই বাধ্য হয়েই পড়াশোনা ছাড়তে হলো সাজিকে। কিন্তু পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ তাঁর কমলো না। ভবিষ্যতে যেটা তাঁকে খুব সাহায্য করেছে হেলিকপ্টার তৈরিতে। পড়াশোনা ছেড়ে সাজি মেকানিকের কাজে যোগ দেয়। এমনকী জীবনের বেশ কিছুটা সময় বাড়িতে বাড়িতে টেলিভিশন সারানোর কাজও করেছে সে। তবে কিশোর বয়সে পা রেখে একবার প্লেনে চড়ে স্বপ্ন উড়ান তৈরির জেদ আরও বেড়ে গেল। সেই সময় ভাগ্যক্রমে এক পাইলটের সঙ্গে পরিচয় হয় সাজির। তিনিই তাঁকে সুযোগ করে দেন প্লেনে চড়ার। মাত্র ১৫ বছর বয়সে তাঁর প্লেন সম্বন্ধীয় বিভিন্ন কৌতূহল দেখে পাইলটও চমৎকৃত হন। তাই তাঁকে মুম্বইয়ের অফিসে দু-সপ্তাহ রেখে বিভিন্ন বই পড়তে দেন। এরোপ্লেন বা উড়োজাহাজ সম্পর্কিত তাঁর এই 'পাগলামি' দেখে অনেকেই ভেবেছিলেন প্রতিবন্ধকতাকে সঙ্গী করে এই সৃষ্টি তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু করে দেখিয়েছেন সাজি। পাঁচ বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে সাজি তৈরি করেন এক হেলিকপ্টার। এই হেলিকপ্টারে রয়েছে ৬৫ এইচ পি-এর জার্মান ইঞ্জিন, যার ওজন ২৬৫ কিলোগ্রাম। এটি উড়তে পারবে ১০ হাজার থেকে ১৩ হাজার ফুট পর্যন্ত। ১৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় উড়তে সক্ষম এবং তার জন্য প্রয়োজন ১৬ লিটার পেট্রোল। একটি ককপিট তৈরি করতে যেখানে ৪০ হাজার টাকা খরচ হয় সেখানে সাজির খরচ হয়েছে মাত্র ৫ হাজার টাকা। যদিও তিনি নিজের বুদ্ধিতে করেছেন বলেই এতটা সাশ্রয়। এই উড়োজাহাজ তৈরি করতে সাজির খরচ হয়েছে ১৪ লক্ষ টাকা। মূক সাজিরের আঙ্গিক ইঙ্গিতকে ভাষার রূপ দিয়ে সাজিরের বক্তব্যকে সকলের সামনে তুলে ধরে তাঁর স্ত্রী বলেন, "আমি উড়তে চেয়েছিলাম অনেক উঁচুতে, আকাশে ওড়া আমার জীবনের স্বপ্ন, যদি আমার কাছে টাকা থাকতো আমি এর থেকেও ভালো এয়ারক্রাফট তৈরি করতে পারতাম। আমার একমাত্র ছেলেকে ভালো বিদ্যালয়ে পড়াতে পারতাম, ভালো শিক্ষা দিতে, পারতাম। আশা করি আমার এই সৃষ্টির পর সরকার আমাকে এরোপ্লেন সারাইয়ের কাজে ডাকবে।" তবে সাজি এবং তাঁর স্ত্রী মারিয়ার আক্ষেপ, সরকার কোনোভাবে তাঁকে সাহায্য করেনি এই কাজে। সাজির তৈরি এই এয়ারক্রাফটের নাম সাজি এক্স-এয়ার-এস (Jaji X-Air-S)। তাঁর এই এয়ারক্রাফটের কোনো বৈধ লাইসেন্স ছিল না। যদিও পরে ডাইরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশনের কাছ থেকে তিনি লাইসেন্স পান আকাশে ওড়ার। সাজির তৈরি এই এয়ারক্রাফট দেখে উচ্চ প্রশংসা করেন অবসরপ্রাপ্ত উইং কমান্ডার এস কে জে নায়ার। তিনি বলেন, 'সাজিদের সৃষ্টি অসাধারণ।' তবে সাজির ইচ্ছা এখানেই থেমে নেই। তিনি আরও এক হেলিকপ্টার তৈরিতে মজেছেন। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

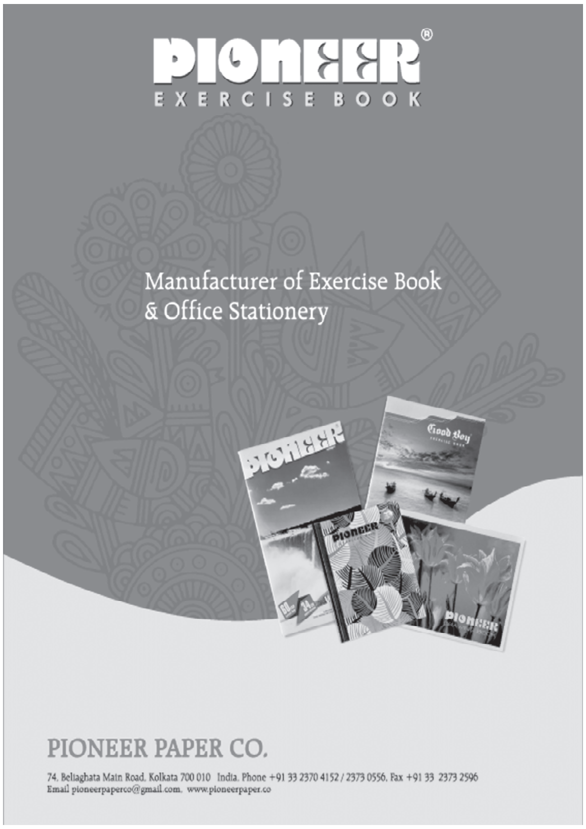

'যে কোনো জাতির পুনর্গঠন তার আদর্শ নিয়ে আরম্ভ করতে হবে। কারণ একটি জাতিকে তিনটি প্রাথমিক উপাদানের বিষয় ভাবতে হয়, প্রথম— দেশ, দ্বিতীয়— দেশের মানুষ, তৃতীয়— জাতীয়তাবোধসম্পন্ন মন। এই তিনটির মধ্যে শেষটি সর্বপ্রধান এবং অপর দুটি নিয়ামক। এতেই বোঝা যায় দেশকে জাতীয়ভাবে পুনর্গঠিত করতে হলে শিক্ষার মতো এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর কিছু নেই।।'

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

দেশভাগের নেপথ্যে লীগের ধ্বংসাত্মক রাজনীতি ও কংগ্রেসের দুর্বল নেতৃত্ব

অমিত ঘোষ দস্তিদার

লেখক শ্রী কে. এন. মণ্ডল তাঁর সাম্প্রতিক প্রকাশিত বই 'Destiny of Bangladeshi Minorities'-এ (অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায় দ্বারা ৩০.৭.২০১৫ তারিখে প্রেসক্লাব, কলকাতায় উন্মোচিত) দেশভাগের নেপথ্যে মুসলিম লীগের ধ্বংসাত্মক রাজনীতি এবং কংগ্রেসের দুর্বল অবস্থানকে দায়ী করেছেন। জিন্নাহ্‌র প্রকাশ্য ঘোষণাকে— 'হয় পাকিস্তান লাভ, নয় ভারত ধ্বংস' যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে নেয়নি কংগ্রেস, যার ফলশ্রুতি ভারত ভাগকে মেনে নেওয়ার মতো নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ। এক চতুর্থাংশেরও কম মুসলমান জনসংখ্যা যাদের মধ্যে বিখ্যাতরা অনেকেই কংগ্রেসের নেতা। যদি ভারতমাতার অঙ্গচ্ছেদ ঘটিয়ে আলাদা মুসলিম দেশ পত্তন করা যায়, তাহলে এই উদাহরণ ভবিষ্যতে আরো অনেক সম্ভাবনার জন্ম দিতে পারে--- কংগ্রেসকৃত এই গভীর ক্ষত কীভাবে মেরামত হবে— এ প্রশ্ন লেখকের মনে জেগেছে। লেখকের বইয়ে ১২৫ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তবকে মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ— 'For the sake of comparison, it may be cited that the present rate of growth of Muslim population in West Bengal, which is always higher than Hindu rate of growth, the Muslim population would equal to or even out number Hindus by ????????

শ্রীমণ্ডল তাঁর লেখায় পাকিস্তানে বসবাসকালে নিজের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার যেমন বর্ণনা করেছেন, তেমনি মুসলমান মৌলবাদীদের দ্বারা সংখ্যালঘুদের উপর ক্রমাগত পরিকল্পিত নির্যাতনের তথা নানা অছিলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মাধ্যমে হিন্দু-নিধন, সম্পত্তি লুট এবং নারী ধর্ষণের ঘটনারও উল্লেখ করেছেন। আর এ ধরণের কাজে দলের এবং প্রশাসনের মদত ছিল আরো বেদনাদায়ক, যার ফলে দেশত্যাগ অনিবার্য হয়ে ওঠে কোটি কোটি ছিন্নমূল মানুষের।

বাংলাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলন যে বাঙালি জাতির উন্মেষ ঘটিয়েছিল, তা বাঙালিদের দীর্ঘদিন প্রেরণা জোগাতে ব্যর্থ হয়েছে। আর সে কারণেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সপরিবারে হত্যার পরেও দ্বিধাতুর বাঙালিরা কোনো প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে না এবং ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্ষিত হয় পদে পদে। আর এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বই বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে বাধ্য করে সংবিধানের মুখবন্ধে 'বিস্‌মিল্লাহি রহমানে রহিম' শব্দমালাকে স্থান দিতে, যদিও ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের বলিষ্ঠ সমর্থনপুষ্ট এই হাসিনা সরকার। শ্রীমণ্ডল তাই সঠিক ভাবেই বাংলাদেশে বসবাসকারী সংখ্যালঘুদের অবস্থা প্যালেস্তাইনবাসীদের থেকেও নিকৃষ্টতর বলে যে মন্তব্য করেছেন তা বাস্তবোচিত— লক্ষ লক্ষ হিন্দুদের বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ তারই সাক্ষ্য বহন করে। যদিও লেখক মনে করেন সংখ্যালঘুরা আওয়ামী লীগের শাসনকালে অপেক্ষাকৃত কম লাঞ্ছিত হয়েছেন— যে সময়টাকে লেখক চিহ্নিত করেছেন 'comic relief in a tragic drama' হিসেবে।

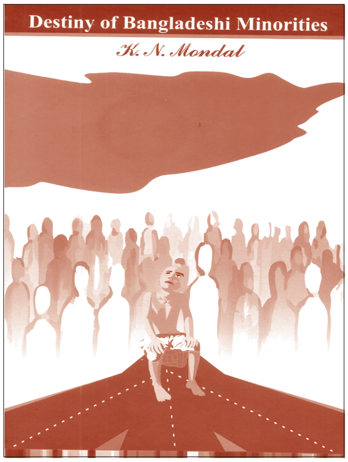

প্রসঙ্গত, লেখক দেশ ভাগের ফলে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের জন্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এবং ড. বি. আর. আম্বেদকরের সরকারি ভাবে লোক-বিনিময়ের তত্ত্বকে সঠিক বলে বর্ণনা করেছেন, যদিও তা কার্যকর সম্ভব হয়নি কংগ্রেস ও নেহেরুর বাধায়। এর ফলে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুরা, যদিও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে পূর্ববাংলার হিন্দুদের অবদান বা ত্যাগ ছিল সর্বোচ্চ। লেখক নিজে ভুক্তভোগী হওয়ায় বাংলাদেশে এখনো বসবাসরত প্রায় দেড় কোটি সংখ্যালঘুর মর্মবেদনা উপলব্ধি করা এবং তাঁদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের সঠিক চিত্রণ সম্ভব হয়েছে। আমার মনে হয় বর্তমান প্রজন্ম যাদের দেশভাগের ইতিহাস বা অভিজ্ঞতায় সম্যক পরিচিতি নেই— তাঁদের এই বইটি পড়া দরকার, কারণ অতীতের সঠিক মূল্যায়ন ভবিষ্যতের যোজনা তৈরিতে সহায়ক হয়।

লেখক অতি সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন, বুদ্ধিজীবী এবং মুক্তমনা যুবক-যুবতীদের আপোষহীন প্রগতিমুখী আন্দোলনের উল্লেখ করে আশা ব্যক্ত করেছেন যে— এই সমবেত সদ্ভাবনা বাংলাদেশকে একটি প্রগতিশীল ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারে, আর তাহলেই খানিকটা হলেও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা রক্ষিত হতে পারে। তবে মুসলিম মৌলবাদীরা যে পদে পদে অন্তরায় সৃষ্টি করবে সে ব্যাপারে লেখক নিঃসন্দেহ।

ডেসটিনি অফ বাংলাদেশী মাইনরিটিস—কে এন মণ্ডল। দাম : ২০০ টাকা।

বিকাশ ভট্টাচার্য।। সেই নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়াম। সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সেই একই উদ্বোধক ও অন্যান্যজন। একুশতম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে মঞ্চে নেই বিদেশ থেকে আগত একজনও চলচ্চিত্রকার। তাঁরা দর্শকাসনে বসে। মঞ্চে বিগত কয়েক বছরের একই পরিচিত মুখ— অমিতাভ, জয়া, শর্মিলা এবং বিদ্যা বালন। এই একঘেঁয়েমি শুধু আমাদের মতো কিছু দর্শকেরই নয়। উদ্বোধক স্বয়ং অমিতাভ বচ্চন ঠাট্টাচ্ছলে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেই

কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চর্বিত-চর্বন

ফেললেন, 'মমতাদি আমাকে আর ডাকবেন না। বাংলা ছবি সম্পর্কে আমার আর কোনো তথ্য জানা নেই। যা জানতাম বিগত কয়েক বছরে সবই বলে ফেলেছি।' অমিতাভের এই স্পষ্ট উক্তি সামলাতে আমাদের দিদি বললেন, 'জানার কি শেষ আছে। আমি কোনো কথা শুনবো না, আপনাকে আসতেই হবে।'

সত্যিই তো! বিগ বি যদি বেঁকে বসেন তাহলে ঐ বিরাট স্টেডিয়াম ভরবে কি করে! মিঠুনও এখন সি বি আইয়ের ডাক পাবার পর থেকে দিদির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন না। যদিও টলিউডের সন্ধ্যা রায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, প্রসেনজিত এবং বয়সের ভারে ন্যুব্জ দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়রাও আছেন। কিন্তু এঁদের দিয়ে তো স্টেডিয়াম ভরবে না। আর স্টেডিয়াম না ভরলে দিদির অনুষ্ঠান মাঠে মারা যাবে।

সেদিন সন্ধ্যায় অন্যতম আকর্ষণ ছিল 'কলকাতা— দ্য হোম অ্যাণ্ড দ্য ওয়ার্ল্ড' শীর্ষক এক উপভোগ্য সঙ্গীতানুষ্ঠান। ওস্তাদ রশিদ খাঁন, পণ্ডিত তেজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, বিক্রম ঘোষ, জর্জ ব্রুকস্, তৌফিক কুরেসী, শিঞ্জিনী কুলকার্নি প্রমুখের সমবেত নিবেদন উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করেছে। উৎসবের উদ্বোধনী ছবি ছিল কোহকি হাসেই পরিচালিত ফিলিপিন্স--জাপানের ছবি 'ব্রাংকো'। প্রতিবারের মতো এবারও দেখা গেল বলিউড তারকাদের অনুষ্ঠান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে স্টেডিয়াম একটু একটু করে খালি হতে লাগলো। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় যিশু সেনগুপ্তের পাশে দেখা গেল সর্বজনপরিচিত বামপন্থী সব্যসাচী চক্রবর্তীকে। কিছুদিন আগে শিল্পীর একটি প্রদর্শনীতে মুখ্যমন্ত্রীও এসেছিলেন। কিন্তু সত্যজিত রায়ের নায়ক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে দেখা গেল না। দেখা গেল না আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কলকাতার চলচ্চিত্রকার বুদ্ধদেব দাশগুপ্তকে বা অপর্ণা সেন, গৌতম ঘোষ, তরুণ মজুমদারকে। এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে সৌমিত্র বলেছেন, "হ্যাঁ, একটা কার্ড পাঠিয়েছিল বটে! ওরকম কার্ড তো আমায় অনেক অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা পাঠায়। ঐভাবে তো যাওয়া যায় না।" এবারের কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের কিছু ভালো দিক আছে। সেরা ছবির জন্য রয়েল বেঙ্গল টাইগার ট্রফি এবং একান্ন লক্ষ নগদ পুরস্কারের সঙ্গে এবছর যুক্ত হয়েছে আন্তর্জাতিক মহিলা পরিচালকদের তৈরি ছবি নিয়ে প্রতিযোগিতায় নতুন সংযোজন 'সেরা পরিচালক'-এর পুরস্কার, যার অর্থমূল্য একুশ লক্ষ টাকা। এই বিভাগে 'এলা' ছবির জন্য সেরা পরিচালক নির্বাচিত হয়েছেন কলম্বিয়ার লিবিয়া স্টেথা গোমেজ। মূল প্রতিযোগিতায় ১৪টি ছবির মধ্যে সেরার শিরোপা পেয়ে পুরস্কার জিতে নিল হাঙ্গেরির লিলি হোরভাত পরিচালিত 'দ্য ওয়েডনেস ডে চাইল্ড'। এবছর জুরি বোর্ডের প্রধান ছিলেন শর্মিলা ঠাকুর।

উৎসবের মোট পনেরোটি বিভাগের মধ্যে দুটি ছিল নতুন। 'ইণ্ডিয়া আনহার্ড' (ভারতের লুপ্তপ্রায় ভাষার ছবি) এবং 'ফিল্মস্ অন স্পোর্টস'। 'ইণ্ডিয়া আনহার্ড' বিভাগে রাভা, কঙ্কনা, টুলু, লাদাখি ইত্যাদি ভাষার মোট ছ'টি ছবি স্থান পেয়েছে। উৎসবে বাংলায় নতুন পরিচালকদের তিনটি ছবি স্থান পেয়েছে। তমাল দাশগুপ্তের 'ভালো মেয়ে খারাপ মেয়ে', স্নেহাশীষ মুখার্জী ও রাত্রি ঘটকের '৯নং পেয়ারা বাগান লেন' এবং প্রণবেশ চন্দ্রের 'চার দিকের গল্প'।

মোট একষট্টিটি দেশের ১৩৭ জন পরিচালকের ১৪৯টি ছবি দেখানো হল। প্রত্যেকটিই উৎকৃষ্ট। শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয় অ্যান্থনি ক্যুইনকে। তাঁর 'জোরবা দ্য ক্যুইন' ছবিটি দেখানো হয়। 'গ্রেটমাস্টার' বিভাগে ছিল জঁ রেনোয়ার ছ'টি ছবি। উমাশশী অভিনীত 'চণ্ডীদাস' ছবিটি দেখার সুযোগ হলো। বোঝা যায়, উৎসবে প্রদর্শিত ছবি বাছাইতে যে কমিটি ছিল তাঁরা যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। বহু ছবি দেখে ছবি বাছাই করেছেন।

সমাবেশ সমাচার

সংস্কার ভারতীর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার আঞ্চলিক শিল্পী সম্মেলন

গত ১৫ নভেম্বর বারুইপুর পদ্মপুকুর মধ্য বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার এক দিবসীয় শিল্পী সম্মেলন। উদ্বোধন করেন প্রদেশ সভাপতি, অভিনেতা ও পরিচালক তপন গাঙ্গুলী। উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায় ও উপদেষ্টা বিকাশ ভট্টাচার্য। সম্মেলনে বীরেন্দ্র কুমার পুরকাইতের নাট্য সমগ্র পুস্তকটির উন্মোচন করা হয়। সংবর্ধনা দেওয়া হয় সাহিত্যিক সনৎ ভট্টাচার্য মহাশয়কে। বিভিন্ন অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন লেখক ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক কার্ত্তিক হালদার।

সমগ্র অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছিলেন জেলা সম্পাদক সুজিত চক্রবর্তী। পর্যবেক্ষণে ছিলেন প্রশান্ত মণ্ডল। সংস্কার ভারতী সম্পর্কে আলোকপাক করেন ত্রিদিব মণ্ডল। জেলার ১২টি স্থান থেকে ৮০ জন শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় যা দর্শকমণ্ডলীকে প্রাণিত করে।

আরোগ্য ভারতীর প্রশিক্ষণ শিবির

আরোগ্য ভারতী, দক্ষিণবঙ্গের উদ্যোগে গত ১৪ থেকে ১৮ নভেম্বর কলকাতায় পারিক ভবনে আরোগ্যমিত্র প্রশিক্ষণ বর্গ অনুষ্ঠিত হলো। কলকাতা ও হাওড়া মহানগর ও সন্নিহিত জেলাগুলি থেকে প্রায় ৩৫ জন শিক্ষার্থী ঐ বর্গে অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পারিক সমাজের সম্পাদক মূলচাঁদ জৈন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পারিক সমাজের সভাপতি মোহনলাল পারিক বর্তমান পরিস্থিতিতে সামাজিক সুস্থতা রক্ষার জন্য আরোগ্য ভারতীর কাজের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক বিদ্যুৎ মুখার্জী প্রমুখ। বর্গে প্রাথমিক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা, ফাস্ট এইড, যোগ-প্রাণায়াম, প্রাকৃতিক চিকিৎসা, ঘরোয়া উপাচার, বনৌষধি পরিচয় ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্বন্ধেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ নরেশ চন্দ্র নাগ, ডাঃ দিলীপ দে, ডাঃ সনৎ কুমার বসুমল্লিক, ডাঃ পার্থ চৌধুরী, ডাঃ শঙ্কর দাস, অসিতবরণ আইচ ও ডাঃ রাজেশ কর্মকার। অধ্যাপক ও গবেষক ড প্রবীর রঞ্জন শূর ভারতীয় ভেষজ যা হোমিওপ্যাথি ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় তার পরিচয় ও পরিবেশ দূষণ থেকে সমাজকে রক্ষা করার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করেন। আরোগ্য ভারতীর সংগঠন সম্পাদক বুদ্ধদেব মণ্ডল ও কোষাধ্যক্ষ তপন কুমার বৈদ্য এই শিবির পরিচালনা করেন। অখিল ভারতীয় আরোগ্য মিত্র প্রমুখ মুরলী কৃষ্ণজী আরোগ্য মিত্রদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে পথ নির্দেশ দেন। বর্গে সমাপ্তি ভাষণ দেন আরোগ্য ভারতীর সম্পাদক ডাঃ গোপাল চন্দ্র কর। অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের ওষুধ- সহ একটি ওষুধের বাক্স প্রদান করা হয়। প্রসঙ্গত, বর্তমান প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ২৫০ জন আরোগ্যমিত্র সেবা কাজে রত।

শ্রদ্ধার ৬৯তম বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ২২ নভেম্বর ১০৩৭তম পূর্ণচন্দ্র দর্শনধন্যা ৮৩ বছর বয়স্কা ইন্দিরা ভট্টাচার্যকে 'শ্রদ্ধা'র বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা হলো। ওই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান তিনবার 'ওঁ'কার ধ্বনি ও মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সূচনা করা হয়।

মঙ্গলদীপ জ্বালান ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সিউড়ি শাখার প্রবীণ সন্ন্যাসী শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ স্বামী তপনানন্দ মহারাজ। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী পূরবী চট্টোপাধ্যায়। শ্রীমত্যা ভট্টাচার্যকে পূজন করেন তাঁর বড় বৌমা। শ্রদ্ধার পক্ষ থেকে অর্ঘ্যস্বরূপ প্রদান করা হয় শ্রীমদ্ভাগবতগীতা, বস্ত্র, নামাবলি, ফল ও মিষ্টান্ন। শ্রদ্ধার পক্ষে বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও পরিবারের পক্ষে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র তথা ইউকো ব্যাঙ্কের প্রাক্তন ম্যানেজার স্বপনকুমার ভট্টাচার্য। সমাপ্তি সঙ্গীত গান শ্রীমতী কাকলী দাস। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন সিউড়ি বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা শ্রীমতী নিবেদিতা চক্রবর্তী। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন পতিতপাবন বৈরাগ্য।

প্রবীণ নাগরিক সংঘের বিজয়া-দীপাবলী সম্মিলনী

গত ১১ নভেম্বর বি এম এস-এর মানিকতলা অফিস-ভবনে প্রবীণ নাগরিক সংঘের বিজয়া-দীপাবলী পরবর্তী মিলন অনুষ্ঠান হয়। এই উপলক্ষে নিজেদের উদ্যোগে ও নিজেদের অংশগ্রহণে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে যেমন ছিল আলোচনা, তেমনই ছিল একক সঙ্গীত, আবৃত্তি ও শ্রুতিনাটক। পরিবেশনায় পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল চৌধুরী এবং বিশ্বজিৎ বোস। বিজয়া ও দীপাবলী সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন বিজয় জশোয়ারা। সংগঠনের সম্পর্ক রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সুদীপ চক্রবর্তী। একাঙ্ক নাটক পরিবেশন করেন শ্রীমতী আল্পনা বসু। শ্রুতিনাটক পরিবেশন করেন বিশ্বজিৎ বোস ও রথীন্দ্রশেখর চ্যাটার্জী। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী শীলা দে।

অনুষ্ঠান শুরু হয় আর এস এসের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক পরমপূজনীয় শ্রীগুরুজীর সংগঠন সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ পাঠের মাধ্যমে। পাঠ করেন সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র দে।

ভাটাকুলে বস্ত্র বিতরণ

বর্ধমান জেলার ভাটাকুল শঙ্খনীমাতা গ্রাম বিকাশ সমিতির পক্ষ থেকে শুভ শারদীয়া উপলক্ষে গত ১৯ অক্টোবর দুঃস্থ ব্যক্তিদের বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

প্রচারক রামজীদাস শর্মা প্রয়াত

বর্ষীয়ান প্রচারক রামজীদাস শর্মা গত ৭ নভেম্বর নিউ দিল্লিতে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তাঁর শেষ ইচ্ছানুযায়ী মৃত্যুর পর তাঁর দেহ মৌলানা আজাদ মেডিকেল কলেজে দান করা হয়। দেশের প্রতি নিবেদিত প্রাণ এই সঙ্ঘপ্রচারক তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে গেছেন। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের দ্বারা দুর্ভাগ্য পীড়িতদের নিয়ে কাজ করার সময় বোমার আঘাতে গুরুতর আহত হন এবং

সারাজীবন ধরে তাঁকে এই ক্ষত বয়ে বেড়াতে হয়। বহুবছর ধরে এ বি ভি পি-র দায়িত্বভার সামলানোর পর তাঁকে ১০ বছরের জন্য পশ্চিমবঙ্গে পাঠানো হয় বি এম এস-এর কাজ দেখভাল করার জন্য। প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেই তিনি এখানে বিএমএসের ভিত শক্ত করেন। তারপর তাঁকে লক্ষ্ণৌ এবং অন্যান্য স্থানে পাঠানো হয় সংগঠনের কাজে। বর্তমানে তিনি দিল্লিতে বি এম এসের সদর দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি তাঁর পৈতৃক সম্পত্তিও সঙ্ঘ কার্যালয়কে দান করেন। কয়েকদিন আগে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য বি এম এসের কলকাতায় এক স্মরণসভা আয়োজন করা হয়। বি এম এসের সদস্যরা ছাড়াও বহু স্বয়ংসেবক তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

শোক সংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মালদহ নগরের উত্তরায়ণ শাখার মুখ্যশিক্ষক অরবিন্দ মণ্ডলের বাবা নগেন্দ্রনাথ মণ্ডল গত ১৮ নভেম্বর চাঁচলের কালিকাপুরের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি তিন পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনীদের রেখে গেছেন।

তিরন্দাজরা কি করবে অলিম্পিকে

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরের বছর বিশ্ব অলিম্পিক আসর থেকে ভারতের মহিলা তিরন্দাজ দীপিকা কুমারীর পদক প্রাপ্তির উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। ভারতের মহিলা টিম এবছর বিশ্বকাপ ও এশিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপের আসরে যে পারফরমেন্স করেছে, তার ভিত্তিতে অলিম্পিকে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারলে দলগত বিভাগ থেকে পদক আসতে পারে। তবে ছেলেদের টিম এখনও পর্যন্ত কোয়ালিফাই করেনি। একমাত্র ব্যক্তিগত বিভাগে মঙ্গল সিংহ চাম্পিয়া যোগ্যতামান অতিক্রম করে রিও অলিম্পিকের ছাড়পত্র পেয়ে গেছেন। ২০১৬ সালের প্রথমার্ধে রিকার্ভ বিশ্বকাপ তিরন্দাজি মিটে যদি ভারত আশানুরূপ ফল করতে পারে তবে টিম হিসেবে যাওয়ার পাশাপাশি ব্যক্তিগত স্তরে রাহুল ব্যানার্জী, জয়ন্ত তালুকদারেরাও রিওগামী বিমানে উঠবেন।

অন্যদিকে মহিলা টিমে দীপিকা কুমারীর দিকে তাকিয়ে আছে গোটা দেশ। রিজার্ভে দীপিকা গত কয়েকবছর ধরেই বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম তিনটি স্থানের মধ্যে আছেন। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন, অলিম্পিক পদকটাই যা অধরা। কলকাতা সাইয়ের মুখ্য মহিলা প্রশিক্ষক তথা প্রাক্তন আন্তর্জাতিক তিরন্দাজ রুমা রায় রীতিমত আশাবাদী দীপিকাকে নিয়ে। কথা প্রসঙ্গে বলেছেন, বিশ্বের সেরা তিরন্দাজদের

দীপিকা কুমারী

সমকক্ষ দীপিকা। গত লণ্ডন অলিম্পিকে নেহাতই দুর্ভাগ্য ও খানিকটা ফোকাস ধরে রাখতে না পারায় পদক হাতছাড়া হয়ে গেছিল। চার বছরে অনেকটাই পরিণত হয়েছেন দীপিকা। তাই বিশ্বের সবচেয়ে বড় মঞ্চে চাপ কাটিয়ে আত্মবিশ্বাস ও সংকল্প ধরে রেখে নিজের মান অনুযায়ী পারফর্ম করতে পারলে যে কোনো একটা পদক অবশ্যম্ভাবী।

দীপিকা ছাড়া মহিলা টিমে আর যে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছে তিরন্দাজ মহল, তিনি হলেন লক্ষ্মীরাণী মাঝি। যথেষ্ট প্রতিভা নিয়ে এসেছেন লক্ষ্মী, দরকার শুধু নিয়মিত আন্তর্জাতিক এক্সপোজার। তবে রিওতে যে পদক পাবেন এমন স্বপ্ন দেখা এখনই উচিত হবে না। সবে আন্তর্জাতিক মিট করা শুরু করেছেন। রিওর অভিজ্ঞতা পরবর্তী অলিম্পিকে কাজে দেবে। অন্যদিকে ভারতের পুরুষ তিরন্দাজ এবং একমাত্র কোয়ালিফাইয়ার মঙ্গল সিংহ রিকার্ড চাম্পিয়া কিন্তু আশাবাদী যে এবারের অলিম্পিক তাকে হতাশ করবে না। সল্টলেকে সাই সেন্টারে সকাল-বিকেল নিবিড় অনুশীলনে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছেন। জিম, যোগাসনও করেন প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় ও রুটিন অনুযায়ী। আন্তর্জাতিক স্তরে বড় বড় টুর্নামেন্টে সাফল্যের স্বাদ পেয়েছেন। আর এবছর যে রকম ছন্দ ও ধারাবাহিকতা দেখিয়েছেন, বিদেশে তা যদি ধরে রাখতে পারেন, তাহলে রিওর পোডিয়াম ফিনিশ একেবারে অসম্ভব নয়। সাইয়ের কোচ এবং অধিকাংশ তিরন্দাজি কর্তার ধারণা, মঙ্গল এবার দেশের জন্য মঙ্গলবার্তা বয়ে নিয়ে আসবেন রিওর মাটি থেকে।

গত দুটি অলিম্পিকে তিরন্দাজরা গ্রুপ লিগের বাধা টপকে নকআউট পর্বে গিয়ে তুল্যমূল্য লড়ে তবেই হার স্বীকার করেছেন। আমেরিকা, ইতালি, ফ্রান্স, চীন, কোরিয়ার মতো জবরদস্ত শক্তিশালী টিমকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আটকে রেখে অন্তিমলগ্নে গিয়ে সামান্য পয়েন্টের ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ে কোর্স ছেড়েছেন মাথা উঁচু করে। এবার সেই ব্যবধানটুকু মুছে ফেলতে বদ্ধপরিকর ভারতীয় তিরন্দাজ, কোচ ও কর্মকতা সবাই। জাতীয় তিরন্দাজি সংস্থা এবং কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক বকলমে সাই সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে তিরন্দাজদের। বিদেশী কোচ, ট্রেনার, ফিজিওকে সারাক্ষণের জন্য পাচ্ছেন তিরন্দাজরা। প্রায় প্রতি মাসেই বিদেশে টুর্নামেন্ট খেলার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক স্তরে নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার অবকাশও যথেষ্ট। স্পনসরদের দাক্ষিণ্যে এবং সরকারের অলিম্পিক গোল্ড কোয়েস্টের উপরের সারিতে অবস্থান করায় তিরন্দাজরা যথেষ্ট ব্যবহারিক ও আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতাও পাচ্ছেন।

এবার তাই দেশকে কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার পালা তিরন্দাজদের। এশিয়াড ও একাধিক বিশ্বকাপ পদক নিয়ে এসেছেন তাঁরা। বাকি শুধু অতি মহার্ঘ্য অলিম্পিক পদকটুকুই।

শব্দরূপ-৭৭০ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

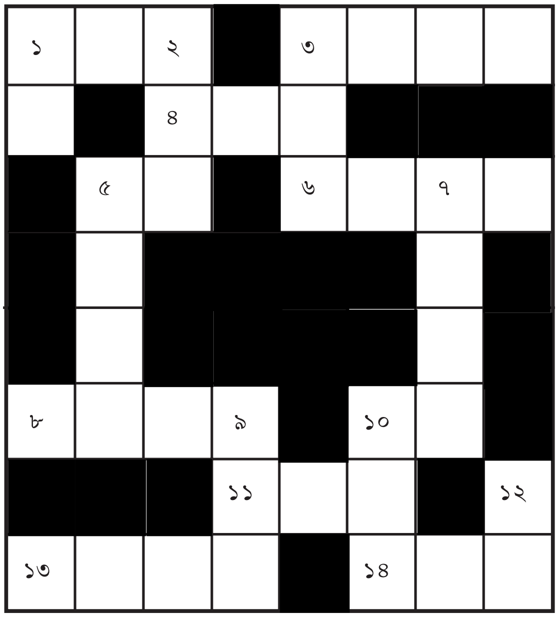

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. হিমালয়স্থ গহ্বর, গঙ্গার উৎপত্তিস্থল, ৩. 'মাগো, আনন্দময়ী—'হয়ো না', ৪. বিভীষণপত্নী, ৫. জ্যোতিষদ্বারা নির্ধারিত মৃত্যুযোগ বা বিপৎসম্ভাবনা, ৬. বিশ্রবামুনির পত্নী, কুবের-জননী, ৮. কণ্ঠুরোগ, ১০. মৎস্য; রাশিচক্রের দ্বাদশরাশি, ১১. জিহ্বা, ১৩. রামায়ণে উল্লিখিত যে অস্ত্রের নিক্ষেপে শত্রুসেনা ঘুমিয়ে পড়ে, ১৪. শসা।

উপর-নীচ : ১. বিখ্যাত রবীন্দ্র-উপন্যাস, ২. পাণ্ডুলিপি, মুসাবিদা, ৩. শ্রীচৈতন্যদেবের মাতৃদত্ত নাম, ৫. হঠাৎ লুব্ধ সুযোগ, ৭. সূর্য, ৯. অস্ত্রহীন, ১০. দক্ষিণাপথের একটি দেবীমূর্তি ও মন্দির, ১২. তিলক; প্রতিষেধক।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৬৭
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

প্র	হ্লা	দ		ঘ	র	শ	ক্র
মা		ম	ন্থ	রা			
	ঘ	ন		না	গ	পা	শ
	টি					ঞ্চ	
	রা					জ	
দ	ম	দ	মা		ব	ন্য	
			ত	ম্বু	রা		স
ঘ	ট	কা	লি		ত	প	তী

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

- ৭৭০ সংখ্যার সমাধান আগামী ৪ জানুয়ারি ২০১৬ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা ।। বিক্রমাদিত্য ।। ১০

থাকে যদি
'ডাটা',
জমে যায় রান্নাটা
ডাটা®
গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়
DUTA
TURMERIC
FRESH N' PURE POWDER
50g
কেনার সময় অবশ্যই
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী)
প্রাইভেট লিমিটেড
নাম দেখে তবেই কিনবেন
CHILLI
POWDER
Kasuri Methi
pure INDIAN SPICES
Krishna Chandra Dutta
(Cookme) Pvt. Ltd.
207 Maharshi Debendra Road,
Kolkata 700007
email : dutaspice@gmail.com

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
14 December - 2015 - Rs. 10.00

দাম : ১০.০০ টাকা